একাত্তরের শহীদ

ডাঃ আলীম চৌধুরী

শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী



একাত্তরের শহীদ ডাঃ আলীম চৌধুরী শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী

একাত্তরের শহীদ

ডাঃ আলীম চৌধুরী

শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী



আগামী প্রকাশনী

বর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ফাল্গুন ১৪০৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭
প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৯৮ ডিসেম্বর ১৯৯১
প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা–১১০০ ফোন ২৩ ১৩ ৩২
প্রচ্ছদ কাইয়ুম চৌধুরী
মুদ্রণে স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ২৭ বি কে দাস রোড ঢাকা
মূল্য ১০০ টাকা
ISBN 984-401-349-6

উৎসর্গ

সেই মাকে
আলীম চৌধুরীকে যিনি
ধারণ করেছিলেন তাঁর গর্ভে

প্রসঙ্গ কথা

যে ঘটনা এ বইয়ে বিধৃত হয়েছে তার প্রত্যক্ষদর্শী আমি।

মহান মুক্তিযুদ্ধের অসংখ্য ঘটনার মধ্যে এ ঘটনা ক্ষুদ্র এবং অকিঞ্চিৎকর হলেও, তা ইতিহাস। ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে আগামী প্রজন্মের কাছে সত্যের উচ্চারণ আমার নৈতিক দায়িত্ব। উপরন্তু দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান স্মৃতি থেকে অনেক কিছুই আড়াল করে দেয়। পাছে আমার স্মৃতি থেকেও তারা ঝরে পড়ে, তাই তা লিপিবদ্ধ করার তাগিদ অনুভব করেছি।

এ ব্যাপারে যাঁরা সার্বিকভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের এবং বিশেষ করে ডাঃ আহমদ রফিকের কাছে আমার অসীম কৃতজ্ঞতা।

আলীমের মৃত্যুর পর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁকে নিয়ে বেশ কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছিলো। সেগুলো থেকে দুটি এ-বইয়ে সংযোজিত হলো। একটি খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস এবং অন্যটি মোহাম্মদ আজিজের।

ডা: তৈয়ব আলী ও ডা: সারওয়ার আলী আলীম সম্পর্কে লিখেছেন। তাঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

মফিদুল হক বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করায় তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

দ্বিতীয় সংস্করণে আলীমের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কয়েকটি লেখা সংযোজন করা হলো; সেগুলোর মধ্যে 'সমাজ ও সাহিত্য' শিরোনামে একটি নিবন্ধ, মীর্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতালের এক অনুষ্ঠানে 'রবীন্দ্র-নজরুল প্রসঙ্গে' শিরোনামে পঠিত প্রবন্ধ এবং 'রাষ্ট্রায়ত্ব স্বাস্থ্য ব্যবস্থা' শিরোনামের অপ্রকাশিত নিবন্ধটি সহ 'সভ্যতার সংকট' শিরোনামে প্রকাশিত একটি ও 'আকাশচারীর উদ্দেশ্যে' শিরোনামে অপ্রকাশিত একটি মোট দু'টি কবিতা পরিশিষ্টে সংযোজন করা হলো।

এই সংস্করণে অনেক ছবি সংযোজন করা হলো।

প্রথম সংস্করণের মুদ্রিত কপি অনেক আগেই শেষ হয়ে যায়। ডাঃ আলীমের প্রতি পাঠকের আগ্রহ দেখে আমি মুগ্ধ, অভিভূত এবং অনুপ্রাণিত হই। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত আগামী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী স্নেহভাজন ওসমান গনির সাগ্রহে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করলেন।

কিছু কিছু ত্রুটি এই গ্রন্থে থেকে যেতে পারে। এজন্য সহৃদয় পাঠকবর্গের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী
জানুয়ারি ১৯৯৭

সেই বধ্যভূমি

রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে আমি কখনও যাইনি। যাওয়ার এবং দেখার ইচ্ছে হয়েছে অনেকবার। কিন্তু যেতে পারিনি। ওখানে হাঁটার কথা ভাবলে আপনা থেকেই পা দুটো আড়ষ্ট হয়ে আসে। হিম হয়ে আসতে থাকে শরীর। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ। মনে হয়, কী করে হাঁটবো সেই পথ ধরে, যার ওপর দিয়ে সার বেধে অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলো তাঁরা!

শুনেছি, মীরপুরের ফিজিক্যাল ইনস্টিটিউটে তাঁদের চোখ বেঁধে, হাত বেঁধে অন্ধকার কুঠুরিতে ফেলে রাখা হয়েছিলো। তারপর কাকডাকা ভোরে লাইন করে দাঁড় করিয়ে গুলি আর বেয়নেট চার্জ করে ক্ষতবিক্ষত করে ইটের ভাঁটায় ফেলে দেয়া হয়েছিলো।

ইটখোলায় ছিলো লাশের স্তূপ। অনেক আগে ঘাতকরা যাদের মেরেছিলো, তাদের লাশ চেনা যায়নি। উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ১৫ থেকে ১৬ ডিসেম্বরের ভেতরে যাদের মারা হয়েছিলো, তাদের লাশ শনাক্ত করা গেছে।

ইটখোলার আশপাশে যাঁরা থাকতেন, তাঁরা গুলির আওয়াজ শুনতেন ভোরের দিকে। সেই সাথে চিৎকার। গোঙানির আওয়াজও শোনা যেতো। রায়ের বাজার বিলের বধ্যভূমি থেকে পালিয়ে আসা মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ওই বধ্যভূমির বর্ণনা দিয়েছেন।

আলবদর বাহিনী আর সবার মতো তাকেও ধরে নিয়ে গিয়েছিলো ১৪ ডিসেম্বরের সকালবেলা ঢাকার শান্তিবাগ এলাকা থেকে। হাত ও চোখ বেঁধে নেয়া হয়েছিলো বদর বাহিনীর ক্যাম্পে। তিনি লিখেছেন, " এরপর বদর বাহিনী আমাদের বাসে করে নিয়ে চললো। কৌশলে চোখের বাঁধন আল্গা রাখার সুযোগ হলো বলে দেখতে পেলাম সামনে বিরাট এক বটগাছ। তার সম্মুখে একটা বিরাট বিল। মাঝে মাঝে কোথাও পুকুরের মতো রয়েছে। বটগাছের আরো কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম ১৩০ থেকে ১৪০ জন লোককে বসিয়ে রাখা হয়েছে। জল্লাদের দল বেয়নেট দিয়ে হত্যালীলা শুরু করে দিয়েছে। ছুঁড়ছে গুলি। চারদিকে আর্ত চিৎকার। আমি চোখের বাঁধনের কাপড়টি সরিয়ে ফেলে খুব জোরে দৌড় দিলাম (দৈনিক বাংলা, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৭২)।"

সেদিন অবিশ্বাস্যভাবে বাঁচতে পেরেছিলেন দেলোয়ার হোসেন; কিন্তু অন্যেরা পারেননি। তারা লাশ হয়ে গেছেন। সেই লাশের স্তূপে আলীম উপুড় হয়ে পড়ে ছিলো। হাত দুটো দড়ি দিয়ে শক্ত করে শরীরের পেছন দিকে বাঁধা। যে গামছা দিয়ে চোখ বাঁধা হয়েছিলো, সেটা গলায় এসে ঠেকেছে। পরনে ছিল লুঙ্গি, গেঞ্জি আর শার্ট।

যখন আমার সুমুখ থেকে ঘাতকরা ওকে নিয়ে যায়, তখন ওর ঘড়িটা হাতে ছিলো। পায়ে ছিলো স্যান্ডেল। মারবার আগে ওরা ঘড়িটা খুলে নিয়েছিলো। আলবদরের নির্মম ধর্মোন্মাদ ঘাতকরা ফিজিক্যাল ইনস্টিটিউটে সারারাত ধরে ওদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে নিশ্চয়ই। ডিসেম্বরের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় গায়ে ওদের কোনোরকম গরম কাপড় ছিলো না। দেশের বরেণ্য কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, সমাজপতি, এমনি আরও অনেক বুদ্ধিজীবীকে কি ভয়ানক ফ্যাসিবাদী কায়দায় সেদিন অত্যাচার করে মারা হয়েছিলো, সেই সব লাশ যারা দেখেছে, সেকথা তাঁরাই শুধু জানেন।

আলীমের বুকে ছিলো অনেক গুলির চিহ্ন। কপালের বাঁ-দিকে এবং তলপেটে ছিলো বেয়নেটের গভীর ক্ষত। আলীমের পাশেই ছিলো ডাঃ ফজলে রাব্বির লাশ। সে লাশেরও ছিলো একই রকম হাল। সবাইকে ক্ষত-বিক্ষত করেই মারা হয়েছে।

১৫ ডিসেম্বরের বিকেল সাড়ে চারটায় আলীমকে ওরা নিয়ে গিয়েছিলো। ডাঃ রাব্বিকেও নেয়া হয়েছিলো ঐ একই দিন বিকেল সাড়ে চারটায়। সারারাত নির্যাতনের পর ১৬ ডিসেম্বরের ভোররাতে তাঁদের মারা হয়েছে। চিরকালের মতো নিভিয়ে দেয়া হয়েছে তাঁদের প্রাণের প্রদীপ। ১৮ ডিসেম্বর সকালে আমরা উদ্ধার করি তাঁদের লাশ।

ওর শরীরটা একটু ফোলা ছিলো, তখনও পচন ধরেনি। গায়ের কাপড়গুলো খুলতে হয়েছিলো কেটে। এই মর্মান্তিক অসহনীয় মৃত্যুদৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে আমার সমস্ত চেতনা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো।

১৫ ডিসেম্বর আলবদরদের বন্দুকের সামনে 'হ্যান্ডস আপ' করা অবস্থায় হেঁটে একটা কাদালেপা ছোট মাইক্রোবাসে উঠে গিয়েছিলো যে মানুষটি, তিনদিন পর ১৮ ডিসেম্বরে সে-ই ক্ষতবিক্ষত একটা লাশ হয়ে ফিরে এলো। ঘটনার এই আকস্মিকতা ধারণ করবার মতো ক্ষমতা আমার ছিলো না। তখন কি যে আমার হয়েছিলো কিছুই আর মনে নেই। কখন আলীমকে গোসল করিয়ে শাদা কাফনে ঢেকে আজিমপুর গোরস্তানের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো, সে কথা আর বলতে পারবো না। কেবল আবছা মনে পড়ে, যেন অনেক মানুষের কাঁধে ধবধবে কাফনে মোড়ানো একটি লাশ ধীরে ধীরে দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো। জলজ্যান্ত একজন মানুষ চোখের পলকে এমন করে হারিয়ে যেতে পারে, আমাকে স্থবির করে দিয়েছিলো এই ভাবনার আলোড়ন।

মার্চের সেই উত্তপ্ত দিনগুলো

মার্চ মাসের উত্তপ্ত দিনগুলোতে সবাই আমরা অস্থির ছিলাম। কিন্তু আলীমের চলাফেরা, মতিগতি, কাজকর্মের ধরন-ধারণ আমাকে অসম্ভব ভাবনায় ভাবিয়ে রাখতো। প্রায় সর্বক্ষণই, বলতে গেলে, অস্বস্তির মধ্যে থাকতাম। আমার ভাবসাব দেখে ও মাঝে মাঝেই বলতো, তোমার এত ভয় পেলেতো চলবে না। মৃত্যু থাকলে ঘরে বসেও আমি মরতে পারি। মৃত্যু না থাকলে বাইরে সারাক্ষণ থাকলেও আমার কিচ্ছু হবে না। তুমি আরেকটু সাহসী হও। আমাকে কাজ করতে দাও। এ রকমভাবেই ও আমাকে আশ্বাস দিতো। মনের ভেতরকার শঙ্কা দূর করবার চেষ্টা করতো।

২৫ মার্চ বিকেলে রোজকার মতোই ও চেম্বারে গেলো। কিছুক্ষণ পর সুধীনদা (গায়ক সুধীন দাশ) এলেন আমাকে গান শেখাতে। কিন্তু গান করা সেদিন আর হলো না। সুধীনদা বললেন, শহরের অবস্থা ভালো মনে হচ্ছে না। আজ চলে যাই। আপনি আলীম সাহেবকে বলুন তাড়াতাড়ি বাসায় চলে আসতে। আজকে রোগী দেখতে গেলে বাসায় ফিরতে দেরি হতে পারে তার।

ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটবে বা ঘটতে যাচ্ছে, আমরা সবাই সেটা আঁচ করতে পারছিলাম। রাতের অন্ধকারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা ছেড়ে চলে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে গত কয়েকদিনকার সব আলাপ-আলোচনা কোনোরকম ফলাফল ছাড়াই ব্যর্থ, এ ঘটনাকে তো আর হালকা করে দেখবার উপায় নেই। মনে তাই নানারকম শঙ্কার উঁকিঝুঁকি।

১৬ মার্চেই শুরু হয়েছিলো মুজিব-ইয়াহিয়ার বৈঠক। ১৮, ১৯, ২০, ২১ ও ২২ মার্চেও অব্যাহত থাকে সেই আলোচনা। আর এতে করে একটা রাজনৈতিক মীমাংসার আশা আমাদের সকলের মনেই স্বাভাবিকভাবে জেগে ওঠে। খবরের কাগজগুলোতে এরকম আগাম আভাস দেয়া হয়েছিলো যে, ২৩ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া বেতার ভাষণ দেবেন। আর সেই বেতার ভাষণে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করবেন।

সেই সময় দেশের বহু জায়গায় সেনাবাহিনী আর জনসাধারণের সংঘর্ষ চলছিলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা করে বলেছিলেন, এ আলোচনা বৈঠকের অর্থ কি? শহীদের রক্তের সাথে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না।

২৩ মার্চ শেখ মুজিব ছুটির দিন ঘোষণা করলেন। সেদিন আমরা যে যেভাবে পারি বাংলাদেশের পতাকা ওড়াই প্রত্যেক ঘরে ঘরে। কিন্তু ২৫ মার্চ সকালেই আমরা খবর পেলাম, পত্রিকার মারফতই, সেনাবাহিনী দেশের বিভিন্ন জায়গায় আরো প্রায় শ দেড়েক মানুষকে মেরেছে। চট্টগ্রাম বন্দরে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আনা অস্ত্র জাহাজ থেকে খালাস করার সময় গণ্ডগোল হয়েছে। শ্রমিকদের ওপর গুলিবর্ষণ করা হয়েছে সেখানে। ফলে কারো পক্ষে এটা আর বুঝতে অসুবিধে হলো না যে, রাজনৈতিক মীমাংসার নাম করে কালক্ষেপণ করা হয়েছে। আর বাঙালিদের দমন করার জন্য তলে তলে নেয়া হচ্ছে সামরিক প্রস্তুতি। দেশব্যাপী চলছে তাই প্রতিরোধের সংগ্রাম। ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় বেরিকেড দেয়া শুরু হয়ে গেছে। ছাত্র-যুবকদের সবাই নেমে গেছে রাজপথে। বড় বড় গাছ কেটে, ওয়াসার পাইপ ফেলে, যেখানে যেভাবে সম্ভব আর্মির গাড়ি ঠেকাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

দ্রুত ফোন করলাম আলীমকে। আমি তাকে সমস্ত শঙ্কার কথা বলতেই ও বললো, চলে আসছি এক্ষুণি। আমি হাল-হকিকত যতটুকু বুঝতে পারছি, বলতে চাইলাম। ও বললো, সব জানি। আমাকে ভাবনামুক্ত রাখবার জন্য সেদিনকার অনেক কথাই ও গোপন রেখেছিলো। পরে সেটা জানতে পেরেছি ওর কাছ থেকেই।

সেদিন চেম্বারে বসে ও খুবই উদ্বিগ্ন মনে রোগী দেখছিলো। দেখছিলো আর সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছিলো আসন্ন বিপদ সম্পর্কে। দূরের রোগীদের অনেককে নিজের গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলো। শুধু পৌঁছেই দেয়নি, অনেককে পরামর্শ দিয়েছিলো বাড়ি থেকে সরে থাকবারও। এসব করেটরে সেদিন ও বাসায় ফিরেছিলো রাত সাড়ে এগারটার দিকে।

সেই রাতেই সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব (স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান) আমাদের বাসায় এলেন। তিনি আলীমের বড় বোনের ননদের স্বামী। ঢাকা এলেই মগবাজারে আপার বাসায় থাকতেন। ওখান থেকেই আওয়ামী লীগের সভায় যেতেন। কাজকর্ম করতেন পার্টির। যতদিন নজরুল ইসলাম সাহেব ঢাকায় থাকতেন, আলীম আর ওর ছোট ভাই হাফিজ ওঁর সাথে নানা আলোচনায় থাকতো মেতে। তিনি এদের দুজনকে খুবই ভালোবাসতেন।

মগবাজার থেকে ভাগ্নে আদিল আর তৈয়ব ওঁকে আমাদের বাসায় নিয়ে এলো। তিনতলায় বাবা-মা থাকতেন। তাড়াতাড়ি করে অসুস্থ বাবাকে দোতলায় নামিয়ে আনলাম। নজরুল সাহেবকে ওখানে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলাম। সমস্ত বাড়ির মধ্যে ওই ঘরটিই ছিলো সবচাইতে নিরিবিলি।

বড্ড শখ করে ওড়ানো বাংলাদেশের পতাকা আমাদের তিনতলার ছাদে লম্বা বাঁশের মাথায় তখনো উড়ছিলো। বড় কষ্টে সেটিকে নামিয়ে আনলাম। সৈয়দ নজরুল এমনিতেই কম কথা বলতেন। সেদিন দেখলাম, তিনি আরো চুপ হয়ে গেছেন। ওঁকে অস্বাভাবিক রকম চিন্তিত দেখাচ্ছিলো।

মগবাজার থেকে পুরানা পল্টনের তিনতলায় ওঁকে নিয়ে আসা হলো। কিন্তু ওঁর অবস্থার কোনোরকম হেরফের নেই। তিনি যেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তবুও সবাই ওঁকে নিয়ে খেতে বসলাম। কেমন একটা আচ্ছন্ন অবস্থায় কি যে খেলেন তার কিছুই যেনো ওঁর বোধে জাগলো না। এক সময় দেখলাম, 'বোন প্লেটে' রাখা কাঁটাগুলো তুলে নিয়ে তিনি নিজের প্লেটে রাখছেন। দ্রুত সামনে থেকে সবকিছু সরিয়ে নিলাম। আলীম ওঁকে ধরে নিয়ে তিনতলায় রেখে এলো।

রাত বারোটার পর হঠাৎ করেই গোলাগুলির প্রচণ্ড শব্দে চারদিক কেঁপে উঠলো। বুঝতে অসুবিধে হলো না, মর্টার, ট্যাঙ্ক, মেশিনগান; কামান সবকিছু নিয়ে পাকিস্তানি আর্মি আক্রমণ করেছে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর। আকস্মিক নির্মমতা আর নির্লজ্জ এক অধ্যায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুঃখে-হতাশায় আমরা মুহূর্তেই নির্বাক হয়ে গেলাম।

মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা ব্যর্থ হলে তার পরিণতি যে শুভ হবে না, সেটা আমরা অনুমান করতে পেরেছিলাম। কিন্তু সেই পরিণতি যে এতো ভয়ঙ্কর, এত ভয়াবহ আর মারাত্মক হবে, সে ছিলো আমাদের বোধের সম্পূর্ণ বাইরে। এমন নির্বিচার গণহত্যা যে হতে পারে, আমাদের ধারণায় তা ঘুণাক্ষরেও আসেনি।

এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখে সৈয়দ নজরুলকে লুকিয়ে রাখাই এখন আমাদের বড় কাজ হয়ে দাঁড়ালো। পাকিস্তানি সৈন্যরা ওঁকে যে মেরে ফেলবে অথবা ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার চালাবে, সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। আমাদের বাসায়ও যদি ওঁকে রক্ষা করতে না পারি, তাহলে ভয়ানক কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে একটা। তাই ওর তিনতলার সব দরজা-জানালা বন্ধ করে, আলো-টালো নিভিয়ে আলীম দোতলায় শোয়ার ঘরে এলো। কিন্তু ওর চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ এতোখানি গভীর ছিলো যে, অসম্ভব অস্থির দেখাচ্ছিলো ওকে। আর সেটা ও লুকিয়েও রাখতে পারছিলো না।

কিছুক্ষণ পরপরই সৈয়দ নজরুলকে ও দেখতে যাচ্ছিলো। আর প্রতিবারই গিয়ে দেখছিলো, ছাদে পায়চারি করছেন তিনি আর টেনে চলেছেন সিগারেট। সে সময় ছাদে বেড়ানো ছিলো খুবই বিপজ্জনক। যে কোনো দিক থেকেই গুলি এসে লাগতে পারতো; কিন্তু নজরুল ইসলাম সাহেবের সেসব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র খেয়াল ছিলো বলে মনে হয় না। তিনি তখন এক উদ্ভ্রান্ত মানুষ যেনো।

২৫ মার্চের সেই ভয়াল-ভয়ঙ্কর রাত কোনোকালে শেষ হবে বলে অন্তত সেদিন মনে হয়নি। জানালা দিয়ে তাকিয়ে আলীম আর আমি দেখছিলাম হিংস্রতার এক নগ্ন চেহারা। প্রচণ্ড শব্দের সাথে সাথে ছোট-বড় আগুনের গোলা। কোনোটা কোনোটা আবার নীল রং ধারণ করে নেমে আসছে মাটিতে। মানুষের আর্তচিৎকারে বোঝা যাচ্ছিলো, ধারে-কাছে কোনোখানেই এইসব গোলা এসে পড়ছে। এভাবেই রাত হলো ভোর। কিন্তু গোলাগুলির শব্দের একটুখানি বিরাম নেই। যেনো অন্তহীন তার অভিযান।

ঘরে বসে থেকেও আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যরা নির্মম আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমাদের ওপর। নৌকোয় ভোট দেয়ার অপরাধে অপরাধী

আমরা। এবার মেরে-কেটে, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে তার শোধ নেবে ওরা। বাংলাদেশের গাদ্দার, কাফের মানুষদের কোনো প্রয়োজন নেই ওদের। প্রয়োজন শুধু পাট, চা আর চামড়ার টাকার। এ দেশের উর্বর মাটিই শুধু ওদের দরকার। মানুষ নয়।

২৬ মার্চ সারাদিন এভাবেই চললো। কোথায় কি ঘটেছে সেদিন আর এসব জানবার কোনো উপায় ছিলো না। টেলিফোনও বিকল। পাকিস্তানিরা আক্রমণ করার সময় হয়তো ঢাকা শহরের অনেক এলাকার টেলিফোন লাইন কেটে দিয়েছিলো। নয়তো রেখেছিলো অকেজো করে।

সৈয়দ নজরুল যেনো একরাতের ব্যবধানেই অনেক বুড়িয়ে গেছেন। মুখে কথাটি নেই। গভীর চিন্তার ছায়া সারাটা চেহারায়। খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। আর এ অবস্থায় ২৭ মার্চ অল্প সময়ের জন্য উঠিয়ে নেয়া হলো কারফিউ। ওঠার পরপরই আমরা বাসা থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। কারণ, এর মধ্যেই খবর পেলাম, ২৬ মার্চ রাতে নজরুল ইসলাম সাহেবের খোঁজে পাকিস্তানি সৈন্যরা মগবাজারে আপার বাসায় ব্যাপকভাবে তল্লাশি করেছে। আপার বড় তিন ছেলেকে ওরা মেরে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছিলো। ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়ে ওদের লাইন করে দাঁড়ও করিয়েছিল। আপা কিছু উর্দু জানতেন। তিনি উপস্থিত পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বললেন, "এরা বাপ মরা ছেলে। এদের ছেড়ে দিন। রাজনীতির কিছু বোঝে না। কোনোকিছুর সঙ্গেই এরা জড়িত নয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম আমার ননদের স্বামী। আর কোনো জায়গা নেই বলে আমার বাসায় এসে উঠতেন। উনি গতকালকেই বাসা থেকে চলে গেছেন।" এই রকম কাকুতিমিনতি করার পরই সে যাত্রা ওরা যাহোক রক্ষা পেয়েছিলো।

নজরুল ইসলাম সাহেবকে খোঁজার জন্য পাকিস্তানি আর্মির লোকজন আমাদের বাসায় যে আসতে পারে এ রকম শঙ্কার পেছনে হেতু ছিলো। কারণ, মগবাজারের অনেকেই আমাদের এই বাসা চেনে। ওখান থেকে কাউকে সঙ্গে করে নিয়ে আসলেই বাসা বের করার ব্যাপারে কোনো রকম অসুবিধাই ছিলো না। আর এ রকম ভাবনা থেকেই আলীম ঠিক করে ফেললো, আমরাই বাসা ছেড়ে চলে যাবো। আমাদের অনুপস্থিতিতে কেউ এলে মা বলে দেবেন, "আমি রোগী নিয়ে আছি। আর কেউ বাসায় নেই।" নজরুল সাহেবকে বলা হলো, তিনি যেন ঘরের ভেতরে দরজা-জানলা বন্ধ করে বসে থাকেন। ঘরের বাইরে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হলো। আমি আর আলীম দুই মেয়ে নীপা-শম্পাকে নিয়ে নাজিমুদ্দিন রোডে আলীমের ফুফাত ভাইয়ের বাসায় চলে গেলাম। যাওয়ার সময় পথে দেখলাম, যেখানে সেখানে লাশ পড়ে আছে।

এরই মধ্যে সবাই মিলে ঠিক করলাম, সৈয়দ নজরুলকে আমাদের বাসা থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। এক জাগয়ায় বেশিদিন থাকলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা বেশি। ঠিক করা হলো, ওঁকে মেয়েদের মতো সাজিয়ে বাসা থেকে অন্য ঠিকানায় নিয়ে যাওয়া হবে। আমাদের এক ভাগ্নে হোসেনি দালানে তার এক চাচির সঙ্গে আলাপ করে জায়গা ঠিক করে এলো।

আমি বাসায় এসে পাশের বাড়ির মতীন সাহেবের স্ত্রীর কাছ থেকে একটা কালো বোরকা নিয়ে এলাম। পরে অবশ্য আর একটি বোরকা কিনে ওকে ফেরত দিয়েছিলাম। তিনি আমার ভাবসাব দেখে তখন হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন, এর মধ্যে কোনো একটা কিন্তু আছে, তবে মুখ ফুটে কিছু বলেননি। আমি বোরকা যোগাড় করে দিয়েই চলে গেলাম আবার নাজিমুদ্দিন রোডে আলীমের সাথে।

আমার শাশুড়ি আর মা দুজনে মিলে সৈয়দ নজরুলকে শাড়ি পরতে সাহায্য করলেন। ওঁকে পরানো হলো পেটিকোট আর ব্লাউজ অর্থাৎ একজন মহিলা যা পরেন, তার প্রায় সবই। পায়ে স্যান্ডেল, মেয়েদের মাথার মতো কালো কাপড় দিয়ে খোঁপাও করা হলো। এসব করার পর শরীরে চাপানো হলো বোরকা। মজার ব্যাপার, এসব করার বেলায় সৈয়দ নজরুল মোটেও আপত্তি করেননি। আমার ছোট ভাই স্বপন ওঁকে বাসার বাইরে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নিলো। পরিকল্পনামতো ডাকা হলো রিকশা। ওঁকে ওঠানো হলো তাতে। পাশে বসলো স্বপন। এক সময় রিকশা রওনা হলো হোসেনি দালানের দিকে।

শাড়ি-বোরকা পরে.নজরুল ইসলাম সাহেব বারবার হোঁচট খাচ্ছিলেন সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে। স্বপন কোনোরকমে ওঁকে ধরে ধরে রিকশায় ওঠালো। এত সাবধানতার পরও একটু পরেই দেখা গেলো, একজন মিলিশিয়া সাইকেলে করে ওদের রিকশার পেছনে পেছনে যাচ্ছে।

স্বপন রীতিমতো ঘামতে লাগলো। শঙ্কার মুখে তাই রিকশাকে সোজাসুজি হোসেনি দালানের দিকে না নিয়ে গলিঘুপচি ঘুরে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে ঠিকানামতো পৌঁছেছিলো। তারপর ফিরতি যাত্রায়ও অনেক ঘোরাঘুরি করে ফিরে এসেছিলো বাসায়।

খবরটা পাওয়ার পর আমরাও বাসায় ফিরে এলাম। হোসেনি দালান থেকে আমার ভাগ্নেরা এবং তাদের চাচাত ভাইরা মিলে নজরুল সাহেবকে দুতিনদিনের ভেতরেই ভারতে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছিলো।

পাকিস্তানি সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করার পর ঢাকায় এসে সৈয়দ নজরুল বলেছিলেন, আমার যে বন্ধু আমাকে বাঁচিয়েছিলেন, তাকে পাকিস্তানিরা মেরে ফেলেছে।

১৯৭২-এর ২২ এপ্রিল সংখ্যার দৈনিক বাংলা লিখেছিলো "২৫ মার্চের কালোরাতে বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী যখন নৃশংসভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো রাজধানী ঢাকার ওপর, তখন সৈয়দ নজরুল ইসলাম গা ঢাকা দিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক ডাক্তার আলীম চৌধুরীর বাসায়"।

"ডাক্তার আলীম চৌধুরী আজ নেই। স্বাধীনতার মাত্র একদিন আগে তিনি বদর বাহিনীর হাতে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন"।

"গতকাল শুক্রবার বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের প্রথম জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে বি.এম. এ ভবন প্রাঙ্গণে শহীদ চিকিৎসকদের স্মৃতিফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম শহীদ চিকিৎসকদের সম্পর্কে স্মৃতিচারণকালে এই তথ্য প্রকাশ করেন।"

কারফিউ একটু একটু করে উঠতে থাকার পর থেকেই চারদিককার খবরাখবর জানার সুযোগ হতে লাগলো। আর সে সুবাদেই জানতে পারলাম, ২৫ মার্চ রাতেই পাকিস্তানি আর্মি শহীদ মিনার গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান, ডঃ এফ. আর. খান, এ. মুকতাদির এবং আরও অনেককেই হত্যা করা হয়েছে সে রাতেই। জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতাকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মেডিকেল কলেজে নেয়া হয়েছিলো। পরে তিনিও মারা যান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন পুড়িয়ে দিয়েছে ওরা। হত্যা করতে দ্বিধা করেনি মধুদাকে। জগন্নাথ হল শেষ। সবাইকে ব্রাশ ফায়ার করে মেরে গণকবর দেয়া হয়েছে। ছাত্রদের অনেক হলই ভারি বোমার আঘাতে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। কতো ছেলে–ছাত্র যে মারা গেছে, তার কোনো হিসেব নেই। সমস্ত ঢাকা শহরের বাজার-বস্তি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে পাকিস্তানি সৈন্যরা।

রাজারবাগের পুলিশরা গড়ে তুলেছে প্রতিরোধ। তারা কেবল তাদের থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল সম্বল করেই খানসেনাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য লড়াই করেছে মরণপণ। বিরাট কনভয় নিয়ে পাকবাহিনী এসেছিলো। সামনে স্ক্র্যাপার। ওটাই বেরিকেড সরিয়ে কনভয়ের পথ করে দিয়েছে। ওদের সঙ্গে গুটিকয় ট্যাঙ্কও ছিল। দুপক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড গোলাগুলির পর পুলিশের কার্তুজ একসময় শেষ হয়ে যায়। মেশিনগান, কামান আর ট্যাঙ্কের সামনে থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল আর কতখানি শক্তি ধরে! তাই উপায়ান্তর না দেখে পুলিশরা পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু অনেকেই ধরা পড়ে যায়। যারা ধরা পড়ে, তাদের রাজারবাগ প্যারেড গ্রাউন্ডে সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ারে মারা হয়। এছাড়াও রাত সাড়ে তিনটের দিকে পুলিশ ব্যারাকগুলোতে খানসেনারা আগুন লাগিয়ে দেয়। এই আগুনে পুড়েও মারা যায় অনেক পুলিশ।

সার্জেন্ট জহুরুল হক হল (ইকবাল হল) ট্যাঙ্ক আর মেশিনগানের গোলায় ধ্বংসপ্রায়। বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যরা হলের ছাত্রদের নির্মমভাবে যাকে যেখানে পেয়েছে, হত্যা করেছে। এমনকি হলের বিভিন্ন কামরা থেকে বই- খাতা এনে খোলা মাঠে জড়ো করে তাতে আগুন লাগিয়ে বহ্ন্যুৎসব পর্যন্ত করে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের মন্ত্র যেখান থেকে সারা বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিলো, সেই ইকবাল হলকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার জন্য নরপশুরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো হিংস্র আক্রোশে।

রোকেয়া হলের পেছনকার বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কোয়ার্টার, পলাশীর দমকল বাহিনীর দফতর, পিলখানা, সদরঘাটসহ সমস্ত ঢাকা শহর যেনো মানুষের মৃতদেহে ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো। ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর, দীর্ঘ নমাসের ভেতরে ওরা প্রতিদিন কতো বাঙালিকে যে মেরেছে, সঠিকভাবে তার হিসেব কে কবে করেছে? ত্রিশ লক্ষ না তার চাইতেও বেশি, কে জানে?

ঢাকা এখন সত্যিকার এক মৃতের পুরী। ২৯ মার্চ হাফিজ গ্রামের বাড়িতে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করলো। ও ছিলো সৈয়দ নজরুলের প্রায় সার্বক্ষণিক সঙ্গী। ওর গাড়িতে

করেই উনি বিভিন্ন জায়গায় গেছেন। ওকে সবাই চেনে। তাই ওর বিপদ হতে কতোক্ষণ? আর আপাতো ছেলেদের নিয়ে এখানে একদণ্ডও থাকবেন না বলে ঠিক করেছেন।

আলীম হাফিজকে বললো, তোরা চলে যা, আমি আসছি কয়েকদিনের মধ্যেই। স্বপনকে ওদের সাথে পাঠিয়ে দিলাম। ওকে ঢাকায় রাখা নিরাপদ মনে হচ্ছিলো না। এই বয়সের ছেলেদের ওপরেই পাকিস্তানি সৈন্যদের বেশি আক্রোশ। শঙ্করকে পাঠিয়ে দিলাম ওর বন্ধু এরশাদের বাসায়। তার নাম রাখা হলো মামুন। ও ৩/৪ দিন পরপর একবার এরশাদের সঙ্গে মোটর সাইকেলে করে এসে আমাদের সঙ্গে দেখাটেখা করে ২০/৩০ মিনিট পরই চলে যেতো।

হাফিজ আর আপা সবাইকে নিয়ে চলে যাওয়ার পর আমরাও দেশে যাওয়ার জন্য মনস্থির করে ফেললাম। আমার অসুস্থ বাবার কি হবে, এই চিন্তায় আলীম অস্থির হয়ে পড়েছিলো। মা আর আমি ওকে বোঝালাম, উনি বুড়ো মানুষ। ওঁকে কেউ কিছু করবে না। আমাদের জন্যেই যতো বিপদ।

শেখ মুজিবের অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে আমরা সবাই তখন অফিস-আদালত বর্জন করেছিলাম। পাকিস্তানি সরকার এরই মধ্যে একদিন ঘোষণা দিয়ে বসলো, অবিলম্বে কাজে যোগদান করতে হবে। আমি সে সময়কার ঢাকা ইংলিশ প্রিপারেটরি স্কুল, বর্তমান উদয়ন বিদ্যালয়ে কাজ করি। আলীম তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের এসোসিয়েট প্রফেসর।

বন্ধুবান্ধব সকলের সাথে পরামর্শ করলাম। প্রায় সকলেই একমত, ঢাকায় থাকলে কাজে যোগদান করতে হবে। আর না হলে ধরা পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিলাম, যতোদিন এখানে আছি, কাজে নিয়োজিত থাকবো। পরে সুবিধামতো চুপ করে সরে পড়বো।

বাসায় মার্চ এবং এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত নিচতলায় ক্লিনিকে রোগী ছিলো। অপারেশন করা হয়েছিলো এইসব রোগীর চোখের ছানি। এরা চলে গেলে আলীম আর নতুন কোনো রোগী ভর্তি করেনি। যে রকম জটিল পরিস্থিতি, কখন, কোথায়, কোন্দিকে চলে যেতে হয়, তার ঠিক নেই। তখন রোগী ফেলে যাওয়াটা মুশকিলের ব্যাপার হতে পারে। তাই নিচতলা খালি হয়ে গেলো। আলীম ৬২/২, পুরানা পল্টনের চেম্বার উঠিয়ে দিয়ে এখানেই রোগী দেখা শুরু করলো। আলীমের এ চেম্বারটি ছিলো ২৯/১, পুরানা পল্টনের ঠিকানায়।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। সকাল আটটা থেকে আলীমের শুরু হয় মেডিকেল কলেজ। তারপর চেম্বার। সবশেষে মেডিকেল এসোসিয়েশন। সব সেরেসুরে ঘরে ফেরে রাত এগারোটার দিকে। কোনোদিন তারও পরে। নিচতলার চেম্বারে থাকলে কাছে তো থাকবে, অন্তত এ সময়টুকু পর্যন্ত।

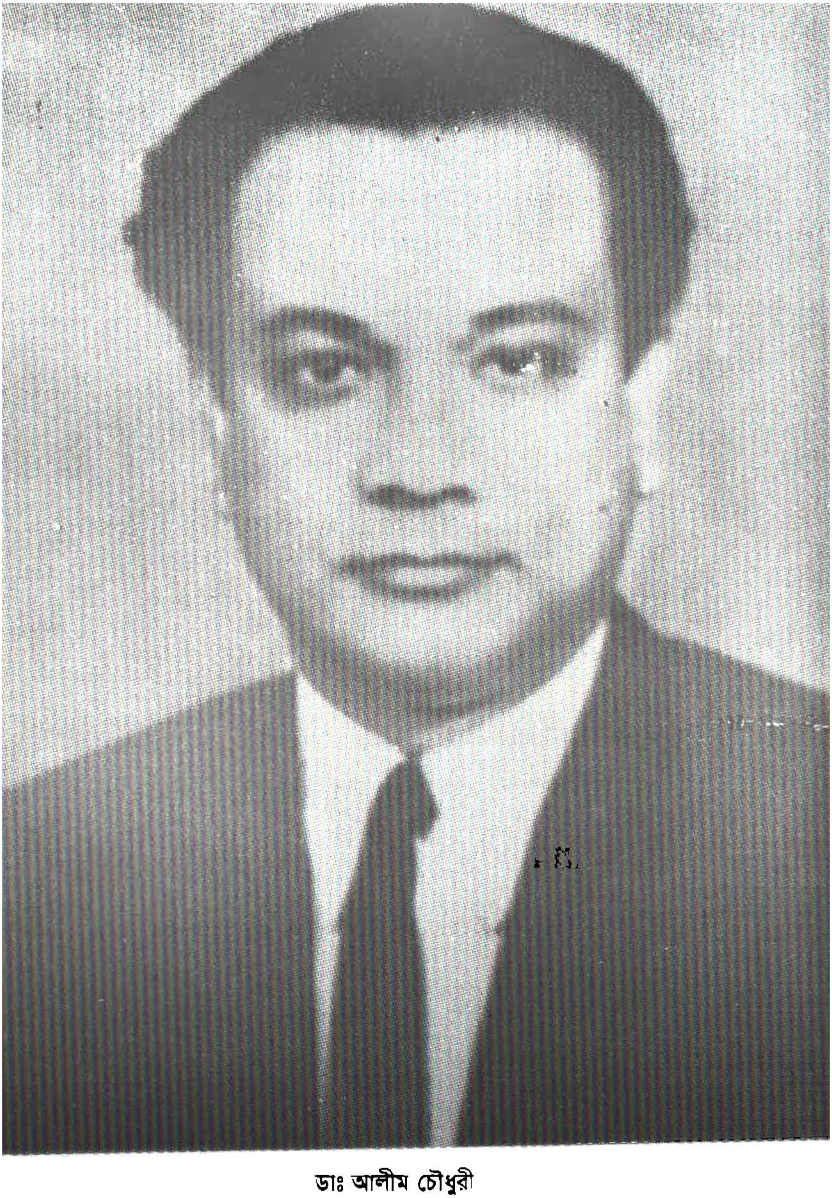
চেম্বার ছিলো বেশ বড়। তাতে করে সুবিধে হলো একটি। পলাতক বন্ধুদের মাঝে মাঝেই আলীম এখানে থাকবার জায়গা করে দিতো। এঁরা দশ-বারোদিন থেকেই চলে যেতেন। আমাদেরও ভালো লাগতো। এই দুর্দিনের দুর্বিপাকে কদিন বা কিছুক্ষণের জন্যে হলেও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মন খুলে কথা বলবার সুযোগ পাওয়া যেতো।

অবরুদ্ধ জীবন

অবরুদ্ধ ঢাকায় আমাদের প্রাণ যখন সত্যি সত্যি ভয়-ভীতি, শঙ্কা আর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় জর্জরিত, সেই তখন, ওই রকম দিনানুদৈনিকতার ভেতরে অনেকখানি স্বস্তি নিয়ে এলো 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'। সারাদিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে বসে থাকতাম এই কেন্দ্রের অনুষ্ঠানমালার জন্যে। সত্যি বলতে কি ঢাকা বেতার কেন্দ্র সেই তখন একদিনের জন্যও খুলিনি। খোলার পর যা শুনতে পেতাম, তাতে করে মনে হতো, রেডিও সেটটা ভেঙে ফেলি এক্ষুণি, এই মুহূর্তেই। খবরের কাগজগুলোরও চেহারা ছিলো একই রকমের। পরিবেশিত সংবাদ থেকে যেটুকু জানবার দরকার, পড়বার পরপরই চোখের আড়াল করে ফেলতাম। প্রথমদিন থেকেই পাকিস্তানিদের ওপর আমাদের মনে জন্ম নিয়েছিলো প্রবল ঘৃণা। ওদের একটি কথাও আমাদের বিশ্বাস হতো না। মনে হতো, সব মিথ্যে। ওদের সব কথাই বানোয়াট। অথচ স্বাধীন বাংলা বেতারের প্রত্যেকটি কথা ধ্রুব সত্যের মতো মনে হতো। মাঝে মাঝে ওপারের কিছু কিছু কাগজপত্রও হাতে পেতাম। মনে হতো, জাতির মুক্তিসনদ যেনো হাতে পেয়েছি।

১৭ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রিসভা গঠিত হলো মেহেরপুরের (মুজিবনগর) বৈদ্যনাথতলায়। সেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের কর্মকর্তারা শপথ গ্রহণ করলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্বাচিত করা হলো রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে। তবে তাঁর অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। পররাষ্ট্র দফতরের দায়িত্বে খন্দকার মোশতাক আহমদ। অর্থ দফতরের দায়িত্ব ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলীর ওপর। স্বরাষ্ট্র দফতর দেখবেন এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান। আর কর্নেল (পরে জেনারেল) আতাউল গনি ওসমানীকে করা হলো সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান।

এসব শুনে, সমস্ত রকমের দুঃখের ভেতরেই আমাদের মনের গভীরে সঞ্চারিত হলো নতুন আশা। দুঃখকে এখন আর অতো ভয় করি না। মনে হয়, সব শেষে আসবে নিশ্চিত বিজয়। সংবাদ এসেছে, এপ্রিলেই জেনারেল ওসমানী গেরিলাবাহিনী ও নৌ-কমান্ডো গঠন করবার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। মে মাসের মধ্যেই তাদের প্রশিক্ষণ শেষ হয়ে যাবে।



ডাঃ আলীম চৌধুরী



ডাঃ আলীমের পিতা-মাতা



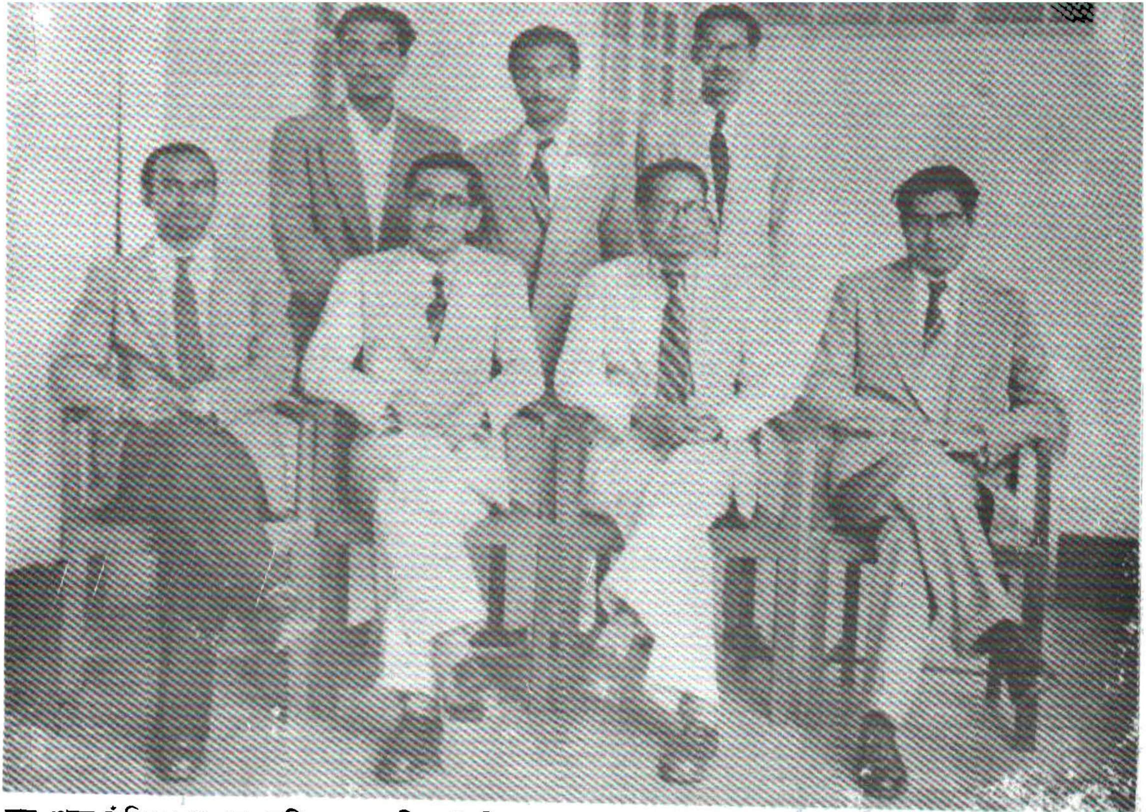
ছাত্রজীবনে ডাঃ আলীম



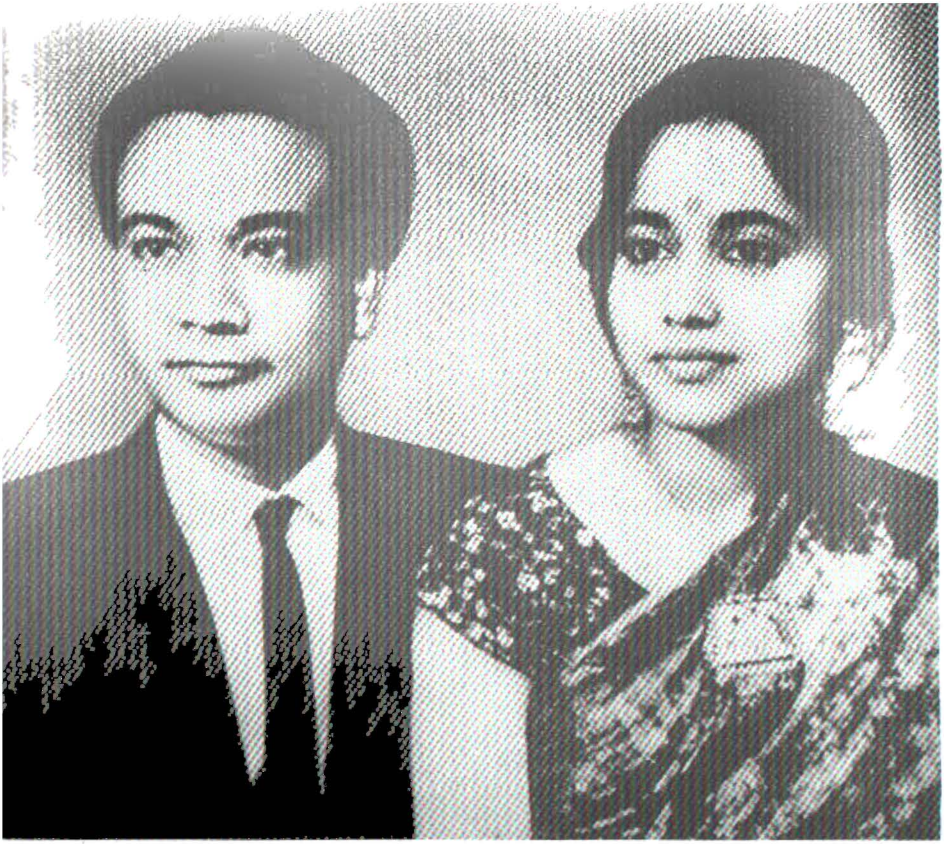
ছাত্রজীবনে ডাঃ আলীম ফটোতোলা ছিল তাঁর প্রিয় শখের একটি



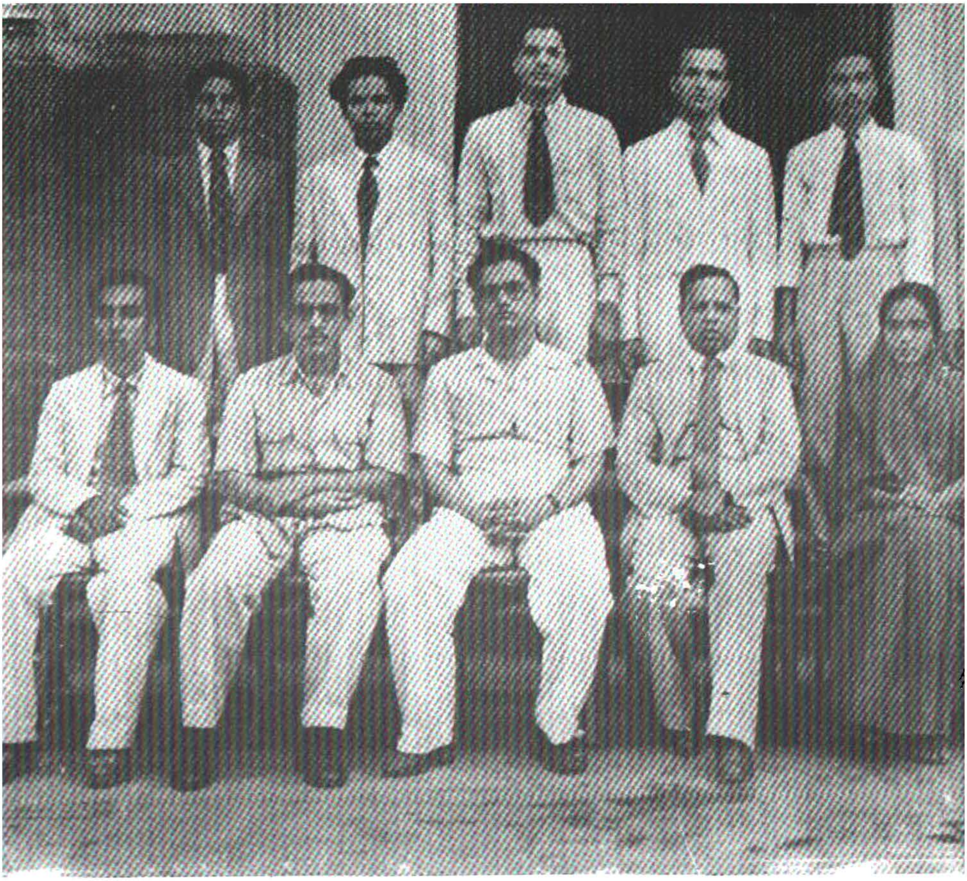
ডাঃ আলীম ১৯৬৪-তে লন্ডনে।



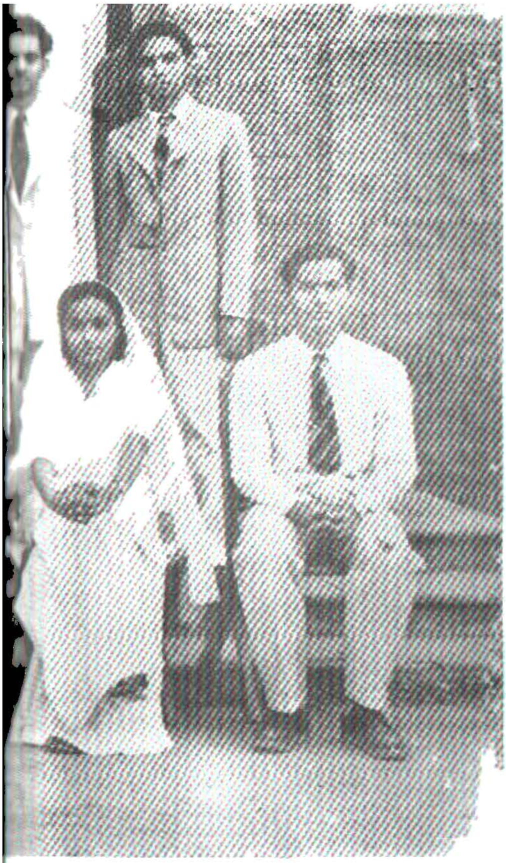
বাম থেকে দাঁড়িয়ে ডাঃ এফ. রাব্বি, ডাঃ আলীম চৌধুরী, ডাঃ এ. আর. সিদ্দিকী বাম থেকে উপবিষ্ট ডাঃ এ. কালাম, ডাঃ এস. এ. আলী, প্রফেসর এ. কে. এস. আহমেদ এবং ডাঃ এ. ওয়াদুদ। ১৯৫৫-এ তোলা ছবি।



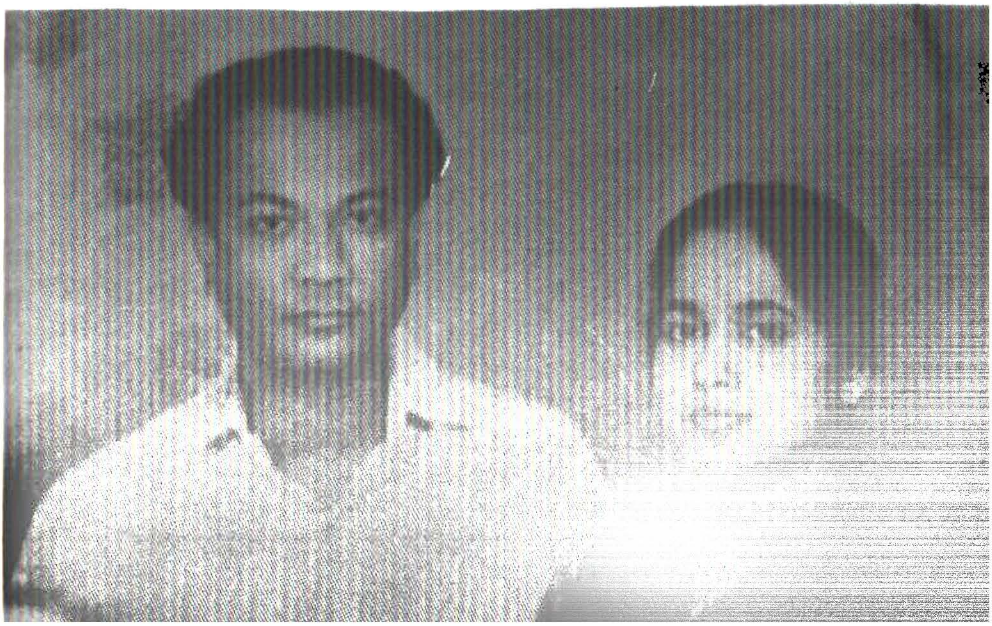
ডাঃ আলীম চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী। ১৯৬৬-তে তোলা ছবি।

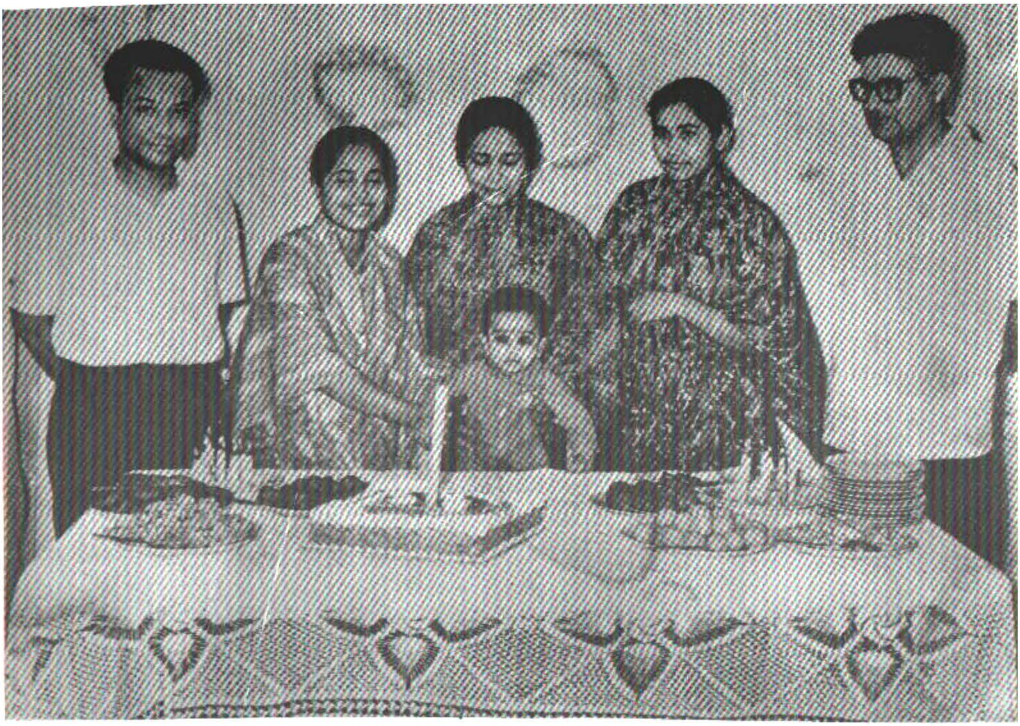


বাম থেকে উপবিষ্ট ডাঃ এফ. হক, ডাঃ এ. আলী, ডাঃ এস. আহমেদ, লে. কর্ণেল জি. আহমেদ, মিসেস এইচ খাতুন, মিস এম. বি. রাহমান এবং ডব্লিউ জামান। বাম থেকে দাঁড়িয়ে নকিউল্লাহ, রফিক চৌধুরী, মুনিস রেজা, আনওয়ারুল আজিম, আলীম চৌধুরী, আবদুল গফুর এবং আলী শামীম।



ডাঃ আলীম চৌধুরী ও
শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী।
১৯৭১-এ তোলা ছবি।



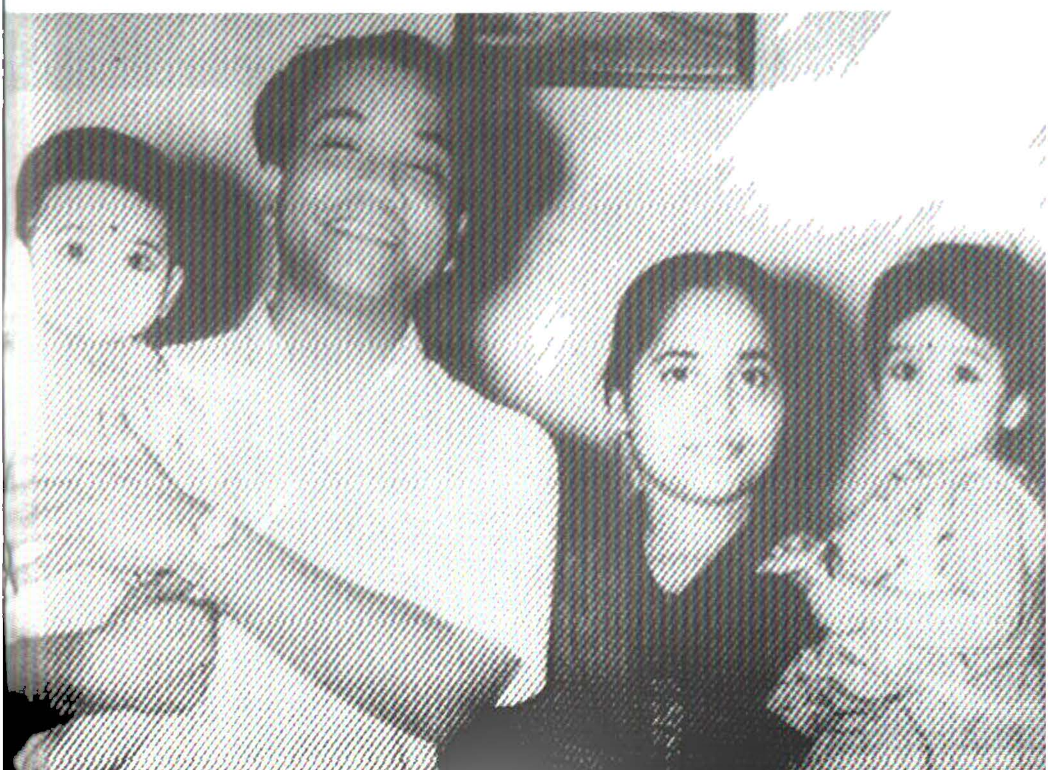


ডাঃ আলীমের বড় মেয়ে নীপার প্রথম জন্ম দিনে

দুই মেয়ে নীপা ও শম্পার সাথে ডাঃ আলীম।



ডাঃ আলীমের কোলে ছোট মেয়ে শম্পা ও শ্যামলীর কোলে বড় মেয়ে নীপা ১৯৬৯-তে তোলা।

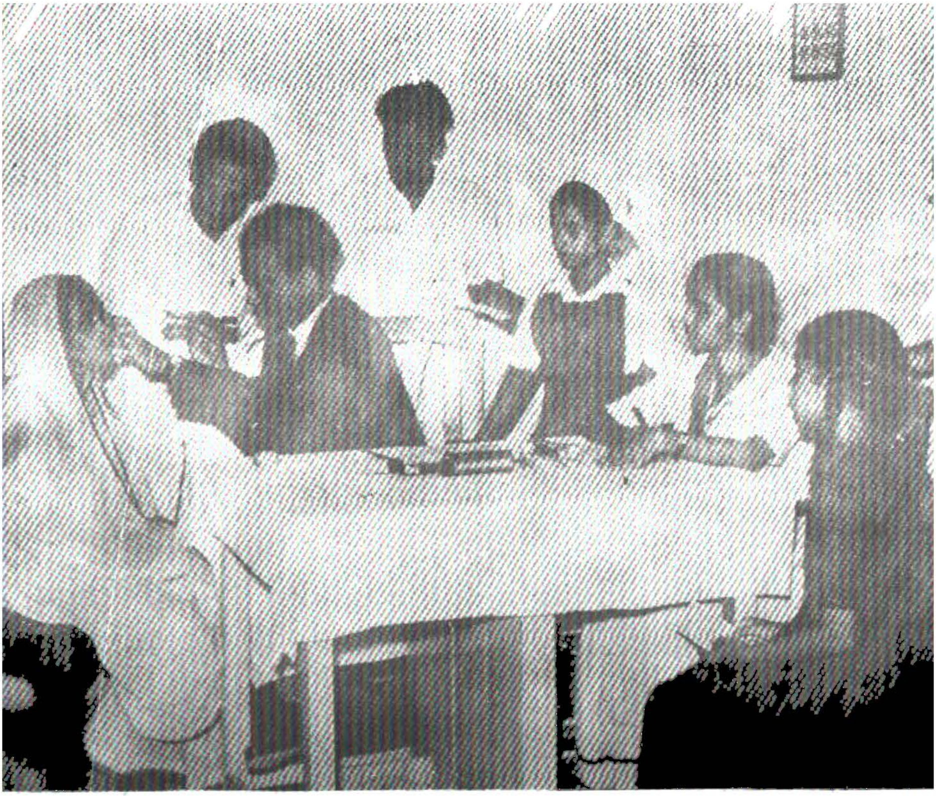




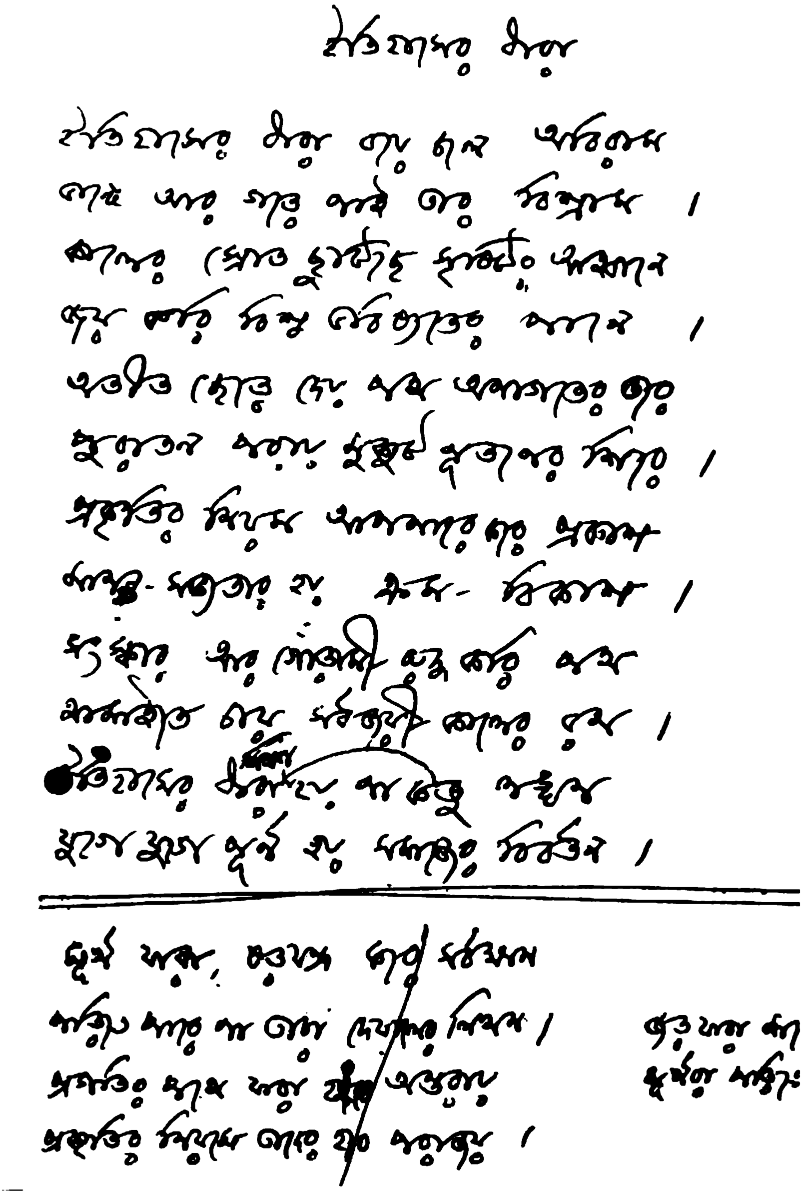
বর্ডারে যুদ্ধাহত সৈনিকদের চিকিৎসার্থে রেডক্রস দলের সাথে ডাঃ আলীম: বাম থেকে ষষ্ঠ। ১৯৬৫-তে তোলা।



মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতালের স্টাফ ও নার্সদের সাথে মাঝখানে উপবিষ্ট ডাঃ আলীম। ১৯৬৫-তে তোলা।



মীর্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় ডাঃ আলীম। ১৯৬৫-তে তোলা।



ডা: আলীম চৌধুরীর অপ্রকাশিত কবিতার পাণ্ডুলিপির একাংশ



রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে ১৮ ডিসেম্বর '৭১-এ তোলা। উপুর হওয়া, সার্ট গায়ে
হাত পেছনে বাধা অবস্থায় প্রথম জন-শহীদ ডাঃ আলীম চৌধুরী।

হলোও তাই। জুন মাসের শেষের দিকেই হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে গেরিলা কায়দায় নাজেহাল করতে শুরু করলো আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা। মুক্তিযোদ্ধাদের এক একটি অপারেশন হতো আর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তার খবর পেতাম আমরা 'চরমপত্র'র মাধ্যমে। আনন্দে-গর্বে আত্মহারা হয়ে যাবার দশা হতো। আর এই মনোভাব আমার একার ছিলো না। ছিলো সমগ্র জাতির।

১৩৭৮ সনের ১২ চৈত্রের দৈনিক 'ইত্তেফাক'-এর স্বাধীনতা সংখ্যায় সরদার ফজলুল করিম লিখেছিলেন : "বন্দী ঢাকার মানুষের মনের প্রার্থনা, হায় আল্লাহ, এই জুলুমের কি শেষ নেই! এই দণ্ডের কি পরাজয় নেই! ঢাকার বুকে বসে স্বাধীন বাংলা বেতারের ধ্বনি শুনতে যেয়ে কতো না মানুষ গ্রেফতার হয়েছে। নির্যাতিত আর নিহত হয়েছে। তবু ও যেনো আমাদের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ। ও যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত। তাই নিজের হৃৎপিন্ডের আওয়াজ শোনার মতোই ট্রানজিস্টার সেট কানের কছে নিয়ে ডায়ালের দণ্ড ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শুনতে চেষ্টা করি : 'স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে বলছি..।'

"হোক না সে আওয়াজ ক্ষীণ। সে কণ্ঠ অশ্রুত প্রায়। তবু তো সে আছে। আর তার থাকাতেই আমাদের থাকা। মার খেয়েও থাকা। মরতে মরতেও বাঁচা। এই বন্দী ঢাকার মৃত জীবনের পরেও অমৃত জীবনের স্বপ্ন"।

"দিন যদি বা কাটে রাতে আর গ্রেনেডের আওয়াজ না শুনলে ঘুম হয় না।"

লেখকরা জাতির বিবেকের কণ্ঠস্বর। সরদার ফজলুল করিমের এ উচ্চারণ ছিলো সেদিনকার মুক্তিকামী সকল বাঙালিরই প্রাণের মর্মমূলের কথা।

ঢাকা মহানগরীর অবস্থা ছিলো অসহনীয়। পথে-ঘাটে বেরুলেই প্রতিদিন চোখে পড়তো মানুষভর্তি ট্রাক চলে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে, কে জানে? সবার চোখ বাঁধা, হাত বাঁধা। এদের নাকি নানা ধরনের কাজ করিয়ে নেবার পর মেরে ফেলা হতো। এমনকি নিজেদের কবর নাকি নিজেদেরই হতো খুঁড়তে।

নদীতে আষ্টেপৃষ্টে দড়ি বাঁধা সারবদ্ধ লাশ ভেসে যাওয়ার খবর আসতো প্রায়ই। মেয়েদের ধরে নেয়ার খবর প্রতিদিন শুনতাম। তাই রাস্তায় বেরুতাম প্রাণটা হাতে নিয়ে। স্কুলে যেতেই হতো। কেননা অনেক খবর ওখান থেকেই আদান-প্রদান হতো। স্কুলে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন খবর নিয়ে আসতো ছেলেরা। লিফলেট বিলি করতো। পরে এগুলো আমরাও লুকিয়ে বিলি করতাম। ঢাকায় অপারেশন শুরু হওয়ার সময় থেকেই পরিচিত ছেলেরা, যারা মুক্তিযুদ্ধে চলে গিয়েছিলো, বাসায় আসতে শুরু করলো। তারা যখন যা চেয়েছে, তাই দিতে চেষ্টা করেছি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ওষুধপত্র হাতে তুলে দিতাম। মা আর ছোট বোন দীপা উলের মেশিন দিয়ে জাম্পার সেলাই করতো। এগুলো ছেলেরা নিজেরাই এসে নিয়ে যেতো। উদয়ন বিদ্যালয়ের আমার সহকর্মী মিসেস এডলিন মালাকার এসব যোগাযোগের ব্যাপারে সাহায্য করতেন।

একদিন আলীমকে আমি বলেছিলাম এসব কথা। শুনে ও আমার ওপর ক্ষেপে গিয়ে বলেছিলো, আমাকে কেন বললে! এ রকম কথা কাউকেই বলতে হয় না। তোমার ডান হাত যা দেবে, বাঁ হাত সেটা জানতে পারবে না। এ নীতি মেনে না চললে তুমি এসব কাজ করতে পারবে না।

বুঝতে পারলাম আমার ভুল হয়েছে। আর কখনও কোনোদিন মুখ খুলিনি কারুর কাছে। আর এমনি করেই আলীমের কাছ থেকে শিখেছি জীবনের বহু কিছু। তাই নিজেকে সবসময় সৌভাগ্যবতী মনে করতাম এমন একজন মানুষকে জীবনে পেয়েছিলাম বলে।

ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার কথা আমরা এখন আর ভাবতেও পারি না। আমি মাঝে মাঝে বললেও আলীম কথাটা একেবারেই উড়িয়ে দেয়। বলে, ঢাকায় এখন অনেক কাজ। সবাই চলে গেলে কী করে চলবে! সত্যিই তাই।

মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ছিলো তাঁর একটা বড় রকমের দায়িত্ব। প্রায়ই ছেলেরা, মুক্তিযোদ্ধারা বাসায় আসতো। আবার আলীম নিজেও যেতো ওদের চিকিৎসা করতে। ওদের গোপন হাসপাতাল ছিলো। ডাক্তার ফজলে রাব্বি এবং আরও অনেকেই ওখানে গিয়ে ওদের চিকিৎসার কাজ করতেন।

আলীমের মৃত্যুর পর একজন মুক্তিযোদ্ধা চোখের ব্যান্ডেজসহ এসে আমাকে বলেছিলো, তাঁর দেয়া আমার চোখের ব্যান্ডেজটি এখনও আছে। কিন্তু আলীম ভাই নেই।

আসলে কারফিউ উঠে গেলেই আলীমের কাজ আরম্ভ হতো। গাড়ির বনেট ভর্তি করে ও ওষুধ সংগ্রহ করতো বিভিন্ন ফার্মেসি আর ওষুধ কোম্পানির কাছ থেকে। এগুলো আবার গোপন ঘাঁটিতে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতো। মুক্তিবাহিনীর জন্য ও বহু টাকা চাঁদাও তুলেছে। কিন্তু গোপনে গোপনে এতো যে কাজ করতো, সেকথা ও কারো কাছে বলতো না। এমনকি আমার কাছেও না। একসঙ্গে, একঘরে, একই ছাদের নিচে পাশাপাশি থেকেও ওর অনেক কাজের খবরই আমি জানতে পারিনি। আলীমের মৃত্যুর পর ওর ডাক্তার বন্ধু-সহকর্মীরা এসে আমাকে এসব বলেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের নমাস এমনভাবে ও কাজ করতো যে অনেকেই ওকে বিপজ্জনক মনে করতেন। এমনকি দূর থেকে ওর গাড়ি আসতে দেখলে অনেকেই তাদের বাড়ির দরজা পর্যন্ত বন্ধ করে দিতেন এই ভয় থেকে যে, আলীমের মতো চিহ্নিত লোক এ বাড়িতে ঢুকলে যদি পাকিস্তানিরা এসে তাদের ধরে নিয়ে যায়! এসব কাজ করতে গিয়েই ও কখনও সময়মতো কোনোদিন বাড়ি ফিরে আসতে পারেনি। প্রতিদিনই কারফিউ শুরু হবার বেশ কিছুক্ষণ পর ও বাড়ি ফিরতো। এই রকম অবস্থায় আমি চিন্তায় অস্থির হয়ে থাকতাম। ফেরার পর দেরি করার কারণ জিজ্ঞেস করলেই বলতো, একটা কাজে আটকে পড়েছিলাম। গাড়িতে 'রেডক্রস'–এর প্রতীক লাগানো আছে। ওরা কিছু বলবে না। ডাক্তারদের মারবে না। অতো ভয় পেয়ো না তো!

আলীমের এসব কথায় আমি কখনো নিশ্চিন্ত হতে পারতাম না। ভয়ে ভয়ে থাকতাম সারাক্ষণ। ও গাড়ি নিয়ে বেরুলেই মনে হতো, আর বোধহয় ফিরবে না। বোধহয় ওর মৃত্যুসংবাদ শুনবো। তবে আমার এইসব এলোমেলো ভাবনার কথা ওর কাছে কোনোদিন প্রকাশ করিনি। কেবল মনে মনে ছটফট করেছি। কিন্তু আমার আশঙ্কা যে অমূলক ছিলো না, সেটা যখন বুঝতে পারলাম, তখন ওর ফেরার পথ চিরকালের জন্য রুদ্ধ।

মুক্তিযোদ্ধারা জুন মাসের শেষের দিকেই হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে বিভিন্নভাবে আক্রমণ চালিয়ে পর্যুদস্ত করতে শুরু করলো। গেরিলা বাহিনীর এইসব তরুণ-যুবক ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে পাকবাহিনীর সেপাই, অফিসার, সেই সাথে তাদের মালামাল ও রসদের ক্ষতি করে ফিরে যেতো। ওদের এ ধরনের কাজগুলোকে বলা হতো অপারেশন। এ ধরনের কোনো অপারেশনের খবর পেলেই আমাদের আনন্দ হতো আর ভাবতাম, বিজয়ের আর বেশিদিন বাকি নেই।

মুক্তিসেনারা দেশের ভেতরে প্রচুর সাহায্য পেয়েছে। আমরা সবসময়ই তৈরি থেকেছি ওদের সাহায্য করার জন্য। সুযোগ পেলেই ওদের জন্য কাজ করেছি।

মৃত্যুর দূত

জুলাইয়ের শেষাশেষি। টিপ টিপানো বৃষ্টিমুখর দিন। সকাল দশটার দিকে আমাদের পাশের বাড়ির মতিন সাহেব মৌলানা আবদুল মান্নান নামে এক ভদ্রলোককে নিয়ে আলীমের কাছে এলেন। আমি দোতলা থেকে দেখলাম ও মতিন সাহেব এবং লোকটিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিচতলাটা দেখাচ্ছে।

আমি প্রথমে কিছুই বুঝতে পারিনি। পরে আলীম এসে বললো, একজন ভদ্রলোক এসেছেন। কারা যেন তার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। স্ত্রী-ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি খুবই বিপদে পড়েছেন। আমাদের নিচতলাটাতো খালিই পড়ে আছে। যদি ক'টা দিন এখানে তাকে আশ্রয় দিই, তা'হলে ভদ্রলোক বেঁচে যান।

আলীমের এত নরম কথায় কিন্তু আগত ভদ্রলোকের ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি হ'লো না। কারণ ওপর থেকে তার চেহারা দেখেই আমার মনের ভেতরে এক ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো। আমি একদম বেঁকে বসলাম, অচেনা কোনো লোককে এসময় বাড়িতে আশ্রয় দেয়া আমার কাছে কেন জানি বিপজ্জনক মনে হলো। আমার মানা শুনে আলীম তাদের নিষেধ করতে গেলো। কিন্তু মতিন সাহেবের অনুরোধ-উপরোধে শেষ পর্যন্ত ও না করতে পারলো না। আবার ওপরে উঠে এলো। আবারো আমার মতামত চাইলো। আমি আলীমের সাথে রীতিমত ঝগড়া শুরু করে দিলাম। বললাম, এদের কিছুতেই আমি জায়গা দেবনা। আমার মাও আমাকে সমর্থন করলেন।

আলীম নিরুপায় হয়ে আমার শাশুড়িকে ধরে বসলো। তাঁকে ও বোঝালো। একজন ভদ্রলোক পরিবার নিয়ে বিপদে পড়েছেন। আমাদের বাড়িতে ঘর খালি। মাত্র কয়েকটা দিনের জন্য থাকতে চাইছেন। তোমার বৌ কেন এত অবুঝ হচ্ছে। তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে বলো।

শাশুড়ির অনুরোধ ফেলতে পারলাম না। আমাকে হার মানতে হ'লো। নিষ্ফল আক্রোশে সেদিন শুধু অঝোরে অনেকক্ষণ কাঁদলাম।

পরের দিনই মৌলানা আবদুল মান্নান স্ত্রী-ছেলেমেয়ে নিয়ে উঠে আসলেন নিচতলায়। ক্লিনিক এবং অপারেশন কক্ষের যাবতীয় জিনিসপত্র ওপরে নিয়ে

আসলাম। শুধু রুগীদের বিছানাগুলো পড়ে থাকলো। চাদর আর বালিশের কভার বদলে দিলাম তাদের থাকার জন্য। তিন-চারদিন পর্যন্ত চা-নাশ্‌তা, দুপুর আর রাতের আহার সবই আমাদের দিতে হলো। কারণ তারা সবাই এক কাপড়ে চলে এসেছে। জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের সবকিছু।

দশ-বারোদিনের মাথায় সবকিছুই জানা গেলো। সেই অসহায় ভদ্রলোকটি আর কেউ নন, আলবদর বাহিনীর সংগঠক মৌলানা আবদুল মান্নান। আর তার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে মুক্তিবাহিনী। শুনে কপালে করাঘাত করা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় থাকলো না। আলীম খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লো। ওর করুণ দশা দেখে ওকে আমি আর কোনো রকম দোষারোপ করিনি। আমার আপত্তির কথা বারবার বলে ওকে আর বিব্রত করার ইচ্ছে হয়নি। কেবল কাজকর্মে আমরা আরও সতর্ক হয়ে গেলাম। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেলো মৌলানা সাহেবের ঘরবাড়ি জিনিসপত্রে ভরে গেছে। তাদের চালচলনে বুঝতে পারলাম, তারা প্রচুর ধনসম্পদের মালিক। এরপর শুরু হলো তাদের বাড়িতে পাকিস্তানি সৈন্যদের আনাগোনা। রাতভর তাদের নিয়ে হৈ-হুল্লোড়।

বুঝতে পারলাম, চুপিসারে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু সে পথও বন্ধ হয়ে গেলো দিন কয়েকের মাথায়। একদিন দেখি, মৌলানার গেট এবং আমাদের গেট দু'দিকেই দু'জন করে বন্দুকধারী পাহারায়। তবে তাদের পোশাক একটু ভিন্ন ধরনের। পরে জেনেছিলাম, এরা আলবদর বাহিনীর লোক।

আমাদের গেটে কেন পাহারাদার এই আপত্তি জানালে মৌলানা বললেন, বাসার নিরাপত্তার জন্যই এই ব্যবস্থা। কারণ, তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের চিঠি পেয়েছেন। তাতে লেখা, "আলীম ভাই দোতলায় না থাকলে কবেই তোমাকে বোমা দিয়ে উড়িয়ে দিতাম।" একথা শোনার পর আলীম আর আমি ভীষণ মুষড়ে পড়লাম। এবার মৌলানা আমাদের চিনে ফেলেছে, যেকোনো সময় বিপদ হতে পারে।

এ সময়ই নতুন আরেকটা ঝামেলা এসে হাজির হলো। রাজশাহীর বদলি আর ঠেকানো গেলো না। বদলির আদেশ পাওয়ার পর অনেকদিন আলীম ছুটি নিয়েছিলো। এবার চিঠি এসেছে, রাজশাহী না গেলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অনন্যোপায় হয়ে অক্টোবরে ও চলে গেলো রাজশাহী। সেই তখন ওর মনের অবস্থা ছিলো অবর্ণনীয়। মা, কলেজে পড়া বোন, অসুস্থ বাবা আর ছোট দু'টি বাচ্চা নিয়ে আমাকে এই শত্রুপুরীতে রেখে যেতে ওর খুবই কষ্ট হচ্ছিলো।

আম্মা (আমার শাশুড়ি) ওকে রাজশাহী রওনা করে দিয়ে দেশের বাড়িতে চলে গেলেন। তবে প্রতি সপ্তাহেই আলীম ঢাকা চলে আসতো। এর মধ্যেই ঢাকায় বদলি হওয়ার জন্য ওর চেষ্টার অন্ত ছিলো না। অবশেষে সেই চেষ্টার ফল ফললো। নভেম্বরেই সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওকে বদলি করা হলো। আর আমরা যেন

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আলীম রাজশাহী চলে যাওয়াতে খুবই ভয় পেয়েছিলাম। মুখে না বললেও ও সেটা বুঝতে পেরেছিলো। একদিন মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলো, ঢাকায় যেভাবেই হোক চলে আসতে হবে। আর সেটা তোমার জন্যেই।

নভেম্বর ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাস। এ মাসেই দেশের ভেতরে গেরিলা তৎপরতা জোরদার হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে নিচ্ছিলো মুক্তিযোদ্ধারা। মুক্তাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিলো স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শাসন। নভেম্বরের প্রথমদিকেই কুষ্টিয়া জেলার বিস্তৃত অঞ্চল চলে আসে মুক্তি নিয়ন্ত্রণে। বোঝা গেলো, আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। নতুন আশায় আবার আমরা আন্দোলিত। আপনা থেকেই মনের ভেতরে এরকম প্রতিজ্ঞার জন্ম হলো,স্বাধীন হলে দেশ গড়ার কাজে আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবো। প্রয়োজন হলে ইটও ভাঙবো। পাকিস্তানি শাসকদের এই দোজখ থেকে মুক্তিকামী মানুষের মনের ভেতরে বুঝি আমাদেরই মতো ভাবনার আন্দোলন!

৪ ডিসেম্বর থেকে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী যৌথভাবে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রায় বিরামহীনভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে চালাতে থাকে উপর্যুপরি আক্রমণ।

৬ ডিসেম্বর ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে বসে। আর এ কারণেই পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে ছিন্ন করে কূটনৈতিক সম্পর্ক। এদিকে ১০ ডিসেম্বর বিদেশীদের ঢাকা থেকে সরিয়ে নেবার জন্য ভারতীয় বিমান হামলা বন্ধ রাখা হয়। তবে এর আগেই পাকিস্তানিদের সবগুলো বোমারুবিমান ভারতীয় বিমান বাহিনী ধ্বংস করে দিয়েছিলো। শত্রুঘাঁটি দেখে দেখে মিত্রবাহিনী বোমা হামলা চালাতো। এই বোমা হামলা প্রতিহত করার আর কোনো রকম ক্ষমতাও ছিলো না পাকিস্তানি সৈন্যদের। ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল এদের বিমান–বিধ্বংসী কামানগুলোও।

১১ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড গ্রেনেড বিস্ফোরণে ঢাকার 'ইউসিস' অফিস ভেঙে পড়ে। সেদিন চোখ দেখাতে এসেছিলেন সাংবাদিক হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ এবং মেসবাহউজ্জামান। তারা দু'জনই আমাদের বাসায় আটকে পড়লেন। কারফিউ আরম্ভ হয়ে যাওয়াতে তারা আর বাসায় ফিরতে পারলেন না।

১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত একটানা কারফিউ চললো। কারফিউ, ব্ল্যাকআউট আর বিমান আক্রমণের মধ্যে আলীম দু'জন সাংবাদিক বন্ধু পেয়ে যেনো হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। রাজনীতি আর যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি নিয়ে দিনরাত তারা আলোচনায় মেতে থাকলো।

১২ ডিসেম্বর খবর পাওয়া গেলো সাংবাদিক সিরাজুদ্দিন হোসেন গ্রেফতার হয়েছেন। আর এ খবর পাওয়া গেলো মৌলানা মান্নানের কাছ থেকেই। স্পষ্ট আঁচ করা গেলো যে, ব্যাপক ধরপাকড় চলছে। সাংবাদিক বন্ধুরা আলীমকে বললেন, আলবদরদের তালিকায় আপনার নাম থাকা অস্বাভাবিক নয়। আপনি যতো তাড়াতাড়ি

পারেন এ বাড়ি ছেড়ে চলে যান। ১৩ ডিসেম্বর কারফিউ ওঠার পর তারা দুজন চলে গেলেন।

ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপক বোমা হামলা হচ্ছিলো। পুরানা পল্টনের কাছেই সেই সময়কার গভর্নর হাউস। ওখানে বোমা হামলার সময় মনে হয়েছিলো, আমাদের বাড়ির ওপরেই বুঝি বোমা পড়েছে। বোমা হামলা শুরু হলেই আমরা সিঁড়ির নিচে গিয়ে আশ্রয় নিতাম। কখন মারা যাই এ ভয় অবশ্যই ছিল ; কিন্তু যতই বেশি বোমা হামলা হতো, আমরা ততোই খুশি হতাম। এই সময় মনের ভেতরে আশা আর নিরাশার খেলা চললেও মনে হতো, আমরা বেঁচে না থাকলেও দেশতো স্বাধীন হবে। আর এই একটিমাত্র ভাবনাই আমাদের মনের সব দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়েছিলো।

ওদিকে মৌলানা মান্নান আলীমকে বোঝাতেন, সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে নোঙর করেছে। অল্প কয়েকদিনের ভেতরেই আমাদের এখানেও এসে উপস্থিত হবে। মৌলানার কথা শুনে ঘরে এসে আলীম হাসতো আর শ্লেষের সুরে বলতো, মৌলানা বোকার স্বর্গে বাস করছে। ওদের রক্ষা করার জন্য নাকি আমেরিকা বাবা এসে পড়েছে। বলে কি, আর দুদিন পরই দেশ স্বাধীন হবে, আর এখনও রঙিন স্বপ্ন দেখছে!

বাবার তখন অসুখের খুব বাড়াবাড়ি চলছিলো। গত পনেরো-বিশদিন ধরেই তার এই অবস্থা। ডাক্তার ফজলে রাব্বি এসে কয়েকবার তাঁকে দেখে গেছেন। আমাদের বুঝিয়েছেনও এই বলে, প্রস্তুত থাকুন। যেকোনো সময় তিনি মারা যেতে পারেন। পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাবার মৃত্যুর জন্য আমরা মনের দিক থেকে তৈরিই ছিলাম।

এদিকে বোমা হামলা ক্রমশই বাড়ছে। সেইসাথে চারদিক থেকে ধরপাকড়েরও অনেক খবর পাচ্ছি। বাসা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য আমি অস্থির হয়ে গেলাম। প্রতিদিন এই নিয়ে আলীমের সাথে আমি কথা কাটাকাটি করি। কিন্তু ও অনড়। তাই একদিন না পেরে বাচ্চাদের দোহাই দিয়ে বললাম, নীপা-শম্পা এখনো ছোট। ওদের জন্যও তো আমাদের বেঁচে থাকা উচিত। চলো, এ বাসা ছেড়ে চলে যাই।

বাচ্চাদের কথা বলাতে মনটা বোধহয় ওর নরম হয়ে গেলো। বললো, হ্যাঁ যাবো, তুমি তৈরি হয়ে নাও।

১৫ ডিসেম্বর সকাল হতেই বাচ্চাদের খাবার আর কয়েকটা কাপড় গুছিয়ে নিলাম। আজ যে করেই হোক যাবোই। কারো কোনো নিষেধ-বারণ মানবো না। ঠিক হলো, মা আর দীপা বাসাতেই থাকবে বাবাকে নিয়ে। পঙ্গু বাবাকে এখন এখান থেকে সরানো কঠিন ব্যাপার। বাবাকে ফেলে মা বা দীপার যাওয়া সম্ভব নয়।

আলীম মিটফোর্ডে যাওয়ার জন্য তৈরি হলো। বললো, তুমি তৈরি থেকো। আমি আগে জায়গাটা ঠিক করে আসি। কিন্তু ওর কথা আমার মনে দাগ কাটলো না। আমিতো ওকে চিনি। কোনো কাজে আটকে পড়লে নাওয়া-খাওয়া ও সম্পূর্ণ ভুলে যায়। তাই ওকে বললাম, এই তো বেরিয়ে যাচ্ছো। আসবে তো সেই কারফিউ আরম্ভ

হয়ে গেলে। বুঝতে পারছি, আজও আমাদের যাওয়া হবে না। ও বললো, না, না, ঠিক সময়মতোই চলে আসবো।

ঘরে রান্নার কেরোসিন ফুরিয়ে গিয়েছিলো। ওর হাতে একটা টিন ধরিয়ে দিয়ে ফেরার পথে কেরোসিন আনার জন্য বললাম। ও টিনটা হাতে নিয়ে নিচে নেমে গেলো। দোতলার জানলা দিয়ে ওর চলে যাওয়া দেখলাম। তবে সন্দেহ কিন্তু জেগেই থাকলো, আজও যাওয়া হবে কি না!

ভয়ে ভয়ে কাটলো কয়েকটা ঘন্টা। বোমা হামলারও বিরাম নেই। থেকে থেকেই আকাশচেরা শব্দ। বেলা একটা হয়ে গেলো। আরম্ভ হলো কারফিউ। আর ঠিক তখুনি গাড়ি আসার শব্দ পেলাম। বুঝলাম, আলীম এসেছে। গাড়ি গ্যারেজে রেখে ওপরে উঠে এলো ও। হাতে কেরোসিনের সেই টিন। বললো, দিয়েছো তো একটা ফুটো টিন, অর্ধেক কেরোসিনই পড়ে গেছে।

জানতাম না টিনটায় যে ফুটো ছিলো। তাই ওর অভিযোগ নীরবে শুনে আমিও পাল্টা অভিযোগ করে বললাম, বলেছিলাম না তুমি দেরি করে আসবে। আজওতো আমাদের যাওয়া হলো না! ও বললো, কালকে ঠিক চলে যাবো, দেখে নিও। আজ কোনোরকমে থাকি।

দেরি কেন হলো জিজ্ঞেস করতেই বললো, মিটফোর্ড হাসপাতালে কাজ শেষ করে প্রিন্সিপাল ডাঃ লতিফের কাছে গিয়েছিলো। হাসপাতালে আমাদের নিয়ে উঠবার অনুমতি নেবার জন্য। কিন্তু কুখ্যাত রাও ফরমান আলীর আত্মীয় ডাঃ লতিফ বলেছিলো, "আলীম, আমি দুঃখিত। তোমাকে এখানে থাকতে দিতে পারবো না। তুমি কিন্তু আজ বাড়িতেই থেকো। যেকোনো সময় ডিউটিতে ডাকতে পারি।"

প্রিন্সিপাল সাহেবের কথা শুনে ওর মন খুব খারাপ হয়ে যায়। কারণ এর মধ্যেই বেশ কজন ডাক্তার সপরিবারে হাসপাতালে উঠে এসেছিলেন। অথচ আমাদের সেখানে জায়গা হলো না!

মিটফোর্ড থেকে বের হয়ে আলীম অন্য জায়গা ঠিক করার জন্য গিয়েছিলো নাজিমুদ্দিন রোডে ওর ফুফাত ভাইয়ের ছেলে (প্রাক্তন জজ) আবদুল ওদুদ চৌধুরীদের বাসায়। গিয়েছিলো ওখানে জায়গা হয় কি না, সেটা দেখবার জন্য। ওখানে থাকতেই কারফিউ আরম্ভ হয়ে যায়। ও বাসার সবাই ওকে অনেক অনুরোধ করেছিলো কারফিউর মধ্যে বের না হওয়ার জন্য। এখন মনে হয়, বারবার মনে হয়, ওখানে থাকলে আলবদররা বোধহয় সেদিন ওকে খুঁজে পেতো না। কিন্তু তাদের নিষেধ ও শোনেনি। আমাদের কোনো বিপদ হয় কি না, এই ভেবে ও চলে এসেছিলো।

ঘাতক আলবদরদের হাতে

কিছুক্ষণ পরই আবার শুরু হলো বোমাবর্ষণ। ভারতীয় বোমারু বিমান অনবরত আঘাত হানছে পাকিস্তানি ঘাঁটির ওপর। আমরা কোনোরকমে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম। বিকেলের দিকে বিমান থেকে বোমা হামলা শুরু হলো পিলখানার ওপর।

তখন বিকেল প্রায় সাড়ে চারটা। দোতলার সামনের বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসে আছে আলীম। মা আর আমি দেখছিলাম বোমা হামলার দৃশ্য। ও পাশ থেকে বলছিলো, ভারতীয় বিমানকে বাধা দেয়ার মতো আর কোনো ক্ষমতাই নেই পাকিস্তানিদের। দ্যাখো, ভারতীয় বিমানগুলো ইচ্ছেমতো বোমা ফেলছে। মনে হচ্ছে, যেনো এটা ওদেরই আকাশসীমা। আর এখনও মৌলানা বলে কি না আমেরিকা ওদের রক্ষা করবে। কথা বলছিলো আর হাসছিলো প্রাণ খুলে।

কয়েক মিনিট পরই আমরা একটা গাড়ির শব্দ পেলাম। দাঁড়িয়ে দেখি, মাটি লেপা ছোট মতন একটা মাইক্রোবাস এসে আমাদের বাসার নিচের তলায় মৌলানার গেটের সামনে দাঁড়িয়েছে। এ রকম গাড়ি প্রতিদিনই সময়ে-অসময়ে আসতো তার কাছে। কাজেই গাড়িটা দেখে আমাদের অন্যকিছু মনে হলো না। আলীম শুধু বললো, উঁকিঝুঁকি দিও না, ভেতরে যাও। এই বলে ও বাথরুমে চলে গেলো। আমি আর মা ভেতরে চলে এলাম। এর প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর আমাদের সিঁড়ির নিচেকার বাইরের দরজার বেল বেজে উঠলো। ওপর থেকেই দেখলাম, দুজন আলবদর বন্দুক উঁচিয়ে দরজা খুলতে বলছে।

আলীমকে জিজ্ঞেস করলাম, কি করবো! ও বললো, খুলে দাও। বলেই ও নিচের তলায় মৌলানার কাছে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো। ওকে এগুতে দেখে জিগ্যেস করলাম, কোথায় যাও?

ও বললো, মৌলানা সাহেবের কাছে। তিনি তো অসুবিধে হলেই যেতে বলেছেন।

মৌলানা সাহেব সবসময়ই আলীমকে বলতেন, ডাক্তার সাহেব, আপনি আমাকে বিপদে আশ্রয় দিয়েছেন। আমি জীবন দিয়ে হলেও আপনাকে রক্ষা করবো।

মাঝে মাঝে বাসা ছাড়ার কথা বললেই আলীম আমাকে বলতো, মৌলানা সাহেব আমার কোনো ক্ষতি করবেন না। আমিতো তার কোনো ক্ষতি করিনি। বরং বিপদে সাহায্য করেছি।

সে ভরসাতেই আলীম সিঁড়ি দিয়ে নেমে মৌলানার দরজায় প্রাণপণে শব্দ করতে লাগলো। বারবার অনুরোধ করলো, মৌলানা সাহেব, দরজাটা একটু খুলুন। কিন্তু অনেকবার ডাকার পরও মৌলানা দরজা খুললেন না। শুধু ভেতর থেকে বললেন, ভয় পাবেন না। আপনি যান। আমি আছি। আলীম তখন দৌড়ে উপরে উঠতে যাচ্ছিলো। কিন্তু ততক্ষণে ওরা ঢুকে গেছে ভেতরে। আলীম বলার পর বাসার কাজের ছেলে হাকিম আর মোমিন দরজা খুলে দিয়েছিলো।

ঘাতকরা ওকে দেখেই বললো, হ্যান্ডস আপ। আপনি আমাদের সাথে চলুন।

আলীম বললো, কেন?

ওরা বললো, দরকার আছে।

ও কাপড় বদলে আসতে চাইলো। ওরা বললো, অন্য কাপড়ের দরকার নেই।

কোথায় যেতে হবে জানতে চাইলে বললো, তা গেলেই জানতে পারবেন।

লুঙ্গি আর শার্ট পরেই আলীম ওদের সাথে চলে গেলো। মৌলানার মিথ্যে আশ্বাসে ও হয়তো বিশ্বাস করেছিলো। ওরা দরজার বাইরে যেতেই হাকিম আর মোমিন দৌড়ে ওপরে এসে বললো, সাহেবকে ওরা নিয়ে যাচ্ছে।

আমি ছুটে মৌলানার কাছে গেলাম। কাতর অনুনয়ে ভেঙে পড়লাম তার সামনে। কখনও লোকটার সাথে আমি কথা বলিনি। সামনেও যাইনি কখনো। আজ আর সেসবের কোনো বালাই ছিলো না।

মাইক্রোবাসটা তখনও ছাড়েনি। বললাম, মৌলানা সাহেব, এখনও গাড়িটা ছাড়েনি। আপনি একটু দেখুন। দয়া করে ওদের বলুন, ওকে যাতে ওরা ছেড়ে দেয়।

মৌলানা চুপ করে বসে থাকলেন। গাড়ি ছাড়ার শব্দ পাওয়া গেলো। আমি আর কান্না ধরে রাখতে পারলাম না। এই অবস্থায় তিনি বললেন, অস্থির হবেন না। ওরা আমার ছাত্র। ওরাই ওনাকে নিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার রাব্বিকেও নিয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কেন নিয়ে গেলো?

বললেন, চিকিৎসার জন্য।

কোথায় জানতে চাইলে বললেন, সি. এম. এইচ-এ (কমবাইন্ড মিলিটারি হাসপাতাল)।

মৌলানার কথা শুনে আমি কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে ওপরে উঠে এলাম। মিসেস রাব্বিকে ফোন করলাম। অনেক চেষ্টার পর পেলাম। তিনি বললেন, বিকেল চারটায় ডাঃ রাব্বিকে নিয়ে গেছে। কান্না জড়ানো গলায় বললেন, ওরা কি আর ফিরবে!

একথা শুনে অসম্ভব ভয় পেয়ে গেলাম। নানা অস্পষ্ট আশঙ্কার দোলায় দুলতে লাগলাম ভেতরে ভেতরে। আবার নিচে ছুটে নেমে এলাম। মৌলানাকে বললাম, আপনি আমাকে সঠিক খবর দিন, ও কোথায় আছে?

তিনি বললেন, এতো উতলা হবার কিছু নেই। বললামতো চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেছে। কাজ শেষ হলেই দিয়ে যাবে। ক্যাপ্টেন কাইয়ুমের সাথে আমার কথা হয়েছে।

বললাম, শীতের কাপড় নেয়নি। ওগুলো তাহলে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিন।

বললেন, সে ব্যবস্থা ওরাই করবে।

ওপরে উঠে আবার ফোন করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার টেলিফোন সেট তখন শব্দহীন। আমার আরও দিশেহারা হবার অবস্থা।

আবার ছুটে গেলাম মৌলানার কাছে। বললাম, টেলিফোন ডেড। আমি আপনার ফোন থেকে আলীমের সাথে একটু কথা বলতে চাই।

তিনি বললেন, পাগল হয়েছেন? এখন ওরা ভীষণ ব্যস্ত। দেখছেন না, চারদিকে বোম্বিং হচ্ছে। এখন ফোন করা যাবে না। তবু পীড়াপীড়ি করতে থাকলাম। তখন তিনি বললেন, ঠিক আছে, চলুন আপনাকে ডাক্তার সাহেবের কাছে নিয়ে যাই।

আমি খুশি হয়ে ওপরে উঠে এলাম। মাকে বললাম, যাই। কিন্তু মা যেতে দিলেন না। পরে বুঝেছি, ওটাও ছিলো মৌলানার আর একটা চালাকি।

কী করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ফোনের কাছে এসে চেষ্টা করলাম যোগাযোগ করার জন্য। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। মাঝে–মধ্যে টেলিফোন লাইন পাওয়া যাচ্ছিলো তখন। সামরিক বন্দিশিবিরের ডাঃ ওয়াকিল আহমদকে ফোন করলাম আলীমের ডায়েরিতে উল্লেখ করা নম্বর দেখে। কিন্তু তার উত্তর শুনে তাকে আরো বড় ডাহা মিথ্যেবাদী ছাড়া আর কিছুই মনে হলো না আমার।

ডাঃ ওয়াকিল বললেন, আলীম চৌধুরী সি. এম. এইচ-এ নেই। কাউকে বলবেন না, ওকে মুক্তিবাহিনী ধরে নিয়ে গেছে।

ডেপুটি স্পিকার আবদুল মতিন এবং 'প্লেন ট্রুথ ভাষ্যকার' আজিজুর রহমানও আমাকে জানান, তিনি সি. এম. এইচ-এ আছেন। রোগীদের চোখের চিকিৎসা করছেন। এরা সবাই আমাকে এভাবেই মিথ্যে প্রবোধ দিয়ে রেখেছিলো।

রাত ক্রমশ বাড়তে থাকে। কান পেতে বসে থাকি। দরজার বেল শোনার জন্য। সামান্য খুটখাট আওয়াজেও সচকিত হয়ে উঠছিলাম। বারবার মনে হচ্ছিলো, এবার নিশ্চিতই ও এসেছে।

মা লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছিলেন। আমার একবার মনে হলো তাকে গিয়ে বলি, মা কাঁদার কী হলো! কাজ শেষ হলেইতো ও চলে আসবে। ও মারা যাবে কিংবা ওকে মেরে ফেলবে কেউ, এ রকম ভাবনা তখনো আমার মাথায় আসেনি।

এক সময় রাত ভোর হলো। ভাবলাম, রাতে আসেনি। এখন নিশ্চয়ই আসবে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর তাকিয়ে থাকলাম।

মুক্তি, তবু অসম্পূর্ণ আনন্দ

১৬ ডিসেম্বর। আমি বুঝি ঘোরের মধ্যে ছিলাম। সকাল আটটার দিকেই কানে এলো আকাশ–বাতাসচেরা 'জয় বাংলা' ধ্বনি। চারদিকে। মুহূর্তে ছাদের পর ছাদ মানুষজনে ভরে গেলো। স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেবার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলো। এতো কিছুর ভেতরেও আমার কেবলই প্রতীক্ষা, ও কখন আসবে? ও এলেই আমরা নামিয়ে ফেলা পতাকাটা আবার দুজনে মিলে তুলবো।

হাকিম আর মোমিনকে তাড়াতাড়ি করে হাফিজকে খবর দেয়ার জন্য গেণ্ডারিয়া পাঠিয়ে দিলাম।

আমার ভাই দুটি আগেই মুক্তিযুদ্ধে চলে গেছে। আর কাকে বলতে পারি আলীমকে খোঁজার জন্য, ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না।

কিছুক্ষণ পরই মৌলানা একটা পুঁটুলি নিয়ে ওপরে উঠে এলেন। বললেন, দয়া করে একটু আশ্রয় দিন। মুক্তিযোদ্ধারা আমাকে মেরে ফেলবে। আমাদের খাবার ঘরে তিনি আত্মগোপন করলেন।

দুপুরের দিকে হাকিম আর মোমিন ফিরে এলো। ওরা গেণ্ডারিয়া যেতে পারেনি। রাস্তায় এলোপাতাড়ি গোলাগুলি হচ্ছে, তাই। হাফিজকে আর সেদিন খবর দিতে পারিনি।

সেদিন অচেনা এক মুক্তিযোদ্ধা এলো আমাদের বাসায়। হাতে এস. এল. আর। সে মৌলানাকে খুঁজতে এসেছিলো। বললো, ওই শয়তানটা কোথায় আলীম ভাইকে যে মেরেছে?

আমার কাছে কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হলো। ভাবলাম, ছেলেটি না জেনেই বুঝি এসব কথা বলছে। আশপাশের লোকজনও বলাবলি করছিলো, যাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাদের কেউ আর বেঁচে নেই। মাও শুনেছিলেন কিন্তু আমার কাছে বলেননি।

বাসায় লোকজনের আনাগোনা ক্রমশ বাড়ছিলো। আর এরই এক ফাঁকে মৌলানা কখন আমাদের বাসার আশ্রয় থেকে সটকে পড়েছেন, বুঝতেও পারিনি। যাঁরা বাসায় আসছিলেন, তাঁরা আলীমের খবর পেয়েই আসছিলেন সমবেদনা জানাতে।

১৭ ডিসেম্বর খুব ভোরে আবার হাকিম গেণ্ডারিয়ায় চলে গেলো হাফিজকে খবর দেয়ার জন্য। সকাল দশটার দিকে শঙ্করের বন্ধু এরশাদের ছোট ভাই মুক্তিযোদ্ধা কবীর এবং ওর আরেকজন সহকর্মী এলো বাসায়। ওরা আমাকে বললো, আপা, আপনি একটুও চিন্তা করবেন না। আলীম ভাইকে আমরা খুঁজে বের করবোই।

ওরা আর ফিরে আসেনি। পরে শুনেছিলাম, ওরা দুজন সেদিনই মিরপুরে গিয়েছিলো; কিন্তু ওখান থেকে ওরাও হারিয়ে গিয়েছিলো চিরদিনের জন্যে। আর কোনো খবর মেলেনি ওদের।

হাফিজ ১৭ তারিখ সকালেই এলো। সব শুনে ছুটে বের হয়ে গেলো ভাইয়ের খোঁজে। তার বন্ধু কচিভাইকে নিয়ে প্রথমেই ও গেলো ঢাকা ক্লাবে। ওখানে ভারতীয় সেনা অফিসাররা ছিলেন। তাঁরা এ সম্পর্কে কোনো তথ্যই দিতে পারলেন না। অনেক খোঁজা-খুজির পর ও বাসায় ফিরে এলো।

মৌলানার পরিত্যক্ত ঘরে একজন লোক ছিলো, হাফিজ তাকে ধরলো। মারধর করার পর সে মুখ খুললো। বললো, মৌলানা মান্নান আজিমপুরের এক বাসায় আছে। লোকটিকে সঙ্গে করে নিয়ে হাফিজ আর কচিভাই আজিমপুর কলোনির সেই বাসায় চলে গেলো। বাসার লোকেরা বললো, মৌলানা সাহেব এখান থেকে চলে গেছেন। একথা শুনে ওরা যখন চলে আসছে, তখন বাইরের একজন লোক বললো, স্যার, এই বাসাতেই মৌলানা আছে।

হাফিজ আর কচিভাই জোর করেই তখন বাসায় ঢুকে পড়লো এবং পালিয়ে থাকা মৌলানা মান্নানকে ধরে নিয়ে এলো। বাসায় নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ভিড় জমে গেলো। বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাও ছিলো সেখানে। তারা তাদের আগ্নেয়াস্ত্রের নল মৌলানার বুকের দিকে তাক করে ধরে তাকে মেরে ফেলার জন্য প্রস্তুত হলো। এই অবস্থায় মৌলানা মুখ খুলতে বাধ্য হলো। বললো, আমার আলবদরের ছাত্ররা ডাক্তার সাহেবকে ধরে নিয়ে গেছে। ওরা আমার বাসাতেই আগে এসেছিলো। এখানে বসে চা খেয়েছে। তারপর ওনাকে নিয়ে গেছে। মারার জন্য নেয়নি, চিকিৎসা করানোর জন্য নিয়েছে। তবে এখন তিনি কোথায় আছেন, বলতে পারবো না।

মৌলানা আরও বললেন, শর্ষিনার পীর সাহেব এবং তিনি আলবদর বাহিনীর সংগঠক। এদের তালিকা ওনার কাছে আছে।

এসব শুনে হাফিজ মুক্তিযোদ্ধাদের অনুরোধ করে বললো, ভাই, একে এক্ষুণি না মেরে হাজতে আটকালে আমরা এর কাছ থেকে আলবদরদের খোঁজখবর পাবো। সবাই মিলে ঠিক করলো, তাই করা হোক। এ ব্যাপারে হয়তো মৌলানার কাছ থেকে আরো অনেক গোপন তথ্য জানতে পারা যাবে, তাকে বাঁচিয়ে রাখা হলো এ ভাবনা থেকেই। আর তাই মৌলানা মান্নানকে রমনা থানায় সোপর্দ করা হলো। সেখান থেকে তিনি কীভাবে ছাড়া পেয়েছিলেন, আজও তা আমার কাছে একটা বিস্ময়।

১৭ তারিখ 'দৈনিক পাকিস্তান' 'দৈনিক বাংলাদেশ' নাম নিয়ে বেরুলো। 'কুখ্যাত আলবদর বাহিনীর হাত থেকে এদের বাঁচান'-এই শিরোনামে তাতে লেখা হলো :

"ফ্যাসিবাদী জামাতে ইসলামীর পাণ্ডাদের দ্বারা গঠিত কুখ্যাত আলবদর বাহিনী গত কয়েকদিনে ঢাকার বুকে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিলো। গত এক সপ্তাহ্ যাবৎ এইসব গণদুশমনের দল অধ্যাপক, সাংবাদিক, চিকিৎসক প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের ধরে নিয়ে মোহাম্মদপুরে অবস্থিত তাদের সদর দফতরে আটকে রেখেছে বলে খবর পাওয়া গেছে"।

"গত শুক্রবার রাত থেকে গত ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত কুখ্যাত আলবদর বাহিনী যেসব সাংবাদিককে ধরে নিয়ে গেছে তাদের মধ্যে এ পর্যন্ত যাদের খবর পাওয়া গেছে তারা হচ্ছেন: দৈনিক ইত্তেফাকের একজিকিউটিভ এডিটর জনাব সিরাজুদ্দিন হোসেন, দৈনিক 'সংবাদ'-এর যুগ্ম সম্পাদক জনাব শহীদুল্লা কায়সার, পাকিস্তান অবজারভারের ক্রীড়া সম্পাদক জনাব এম. এ. মান্নান (লাডু ভাই), দৈনিক পূর্বদেশ-এর জনাব আ.ন.ম. গোলাম মোস্তফা, বিবিসির সংবাদদাতা জনাব নিজামুদ্দিন ও পিপিআই'র জনাব নাজমুল, জনাব মোহাম্মদ আখলাক। এছাড়া হক এবং সাবেক সাপ্তাহিক ললনা ও দৈনিক বাংলাদেশ-এর কয়েকজন সাংবাদিকের গৃহেও তারা হানা দিয়েছিলো কিন্তু তখন তাদের পায়নি'।

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মুনীর চৌধুরী, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক জনাব মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ ডাঃ এম. এফ. রাব্বি ও ডাঃ আলীম চৌধুরীকে তারা আটকে রেখেছে"।

"ঘৃণ্য আলবদর বাহিনীর পাণ্ডারা বহুসংখ্যক সাংবাদিক, অধ্যাপক প্রমুখের বাসভবনে হানা দিয়ে তাদের না পেয়ে বাসার লোকদের ওপর অত্যাচার করে। আলবদর গুণ্ডাদের অত্যাচারের খবর পেয়ে যেসব অধ্যাপক, সাংবাদিক বাসা থেকে অন্যত্র সরে গিয়েছিলেন, তাঁরা কোনমতে রক্ষা পেয়েছিলেন। উপরে যেসব বুদ্ধিজীবীর নাম দেয়া হলো এই রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত তাদের কোন খবর পাওয়া যায়নি।"

ওই পত্রিকায় আরেকটি খবর ছিলো, 'টাইগার' নিয়াজি বলে খ্যাত সেনানায়ক ১৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার শেষ বিকেলে রমনায় রেসকোর্স ময়দানে এক অভূতপূর্ব পরিবেশের মধ্যে আত্মসমর্পণ করলেন।..."

এ খবর পড়ে ঘর থেকে আমিও বের হয়ে গেলাম। মনে হলো, এবার দেশ শত্রুমুক্ত। যেখানেই ওদের আটকে রাখা হোক না কেন, অবশ্যই খুঁজে বের করা যাবে।

পথে পথে তখন মানুষের অফুরন্ত ঢল। চারদিকে বিজয়োল্লাস। পতাকা হাতে মুক্তিসেনাদের বিজয় মিছিল। 'জয় বাংলা' স্লোগান। এই শুভ মুহূর্তটি যে কতোখানি কাঙ্ক্ষিত ছিলো আমাদের, সে কথা ভাষায় প্রকাশ করবার নয়। এই শুভদিনটির জন্য দীর্ঘ নমাস কতো না স্বপ্ন দেখেছি! কিন্তু আজ আর নিজেকে এদের সাথে মেলাতে পারলাম না। বুকের ভেতর থেকে শুধু একটা চাপা রুদ্ধ আর্তনাদ বের হয়ে আসতে চাইছিলো। না, অনেক জায়গা ঘুরে, ব্যর্থ হয়ে অবশেষে ফিরে আসতে হলো। কোথাও কোনোরকম আশ্বাসের আশ্রয় নেই।

সেই অন্তিম সন্ধান

১৮ ডিসেম্বর। অবশেষে সন্ধান পাওয়া গেলো ওর। ওদের অনেকের। হাফিজ লুকিয়ে থাকা মিলিশিয়াদের কয়েক দফা গুলি উপেক্ষা করে জায়গাটা খুঁজে পেলো। রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে লাশ হয়ে পড়ে আছে আলীম আরও অনেক বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে। একটা ইটের ভাঁটায় পড়েছিল ডাঃ রাব্বি, আলীম, লাডুভাইসহ আরও অনেকের লাশ। হাফিজ ডাঃ রাব্বিকে দেখেই চিনতে পেরেছিলো।

আলীমের লাশ ছিলো উপুড় করা। হাফিজ প্রথমে চিনতে না পেরে চলে এসেছিলো। আমার ভাইয়ের দুই বন্ধু এরশাদ, আফতাব আর জনাব খান (আলীমের বন্ধু) মরিয়া হয়ে খুঁজছিলেন ওর লাশ। হাফিজ আর মোমিনও ছিলো সঙ্গে। ওরাই প্রথম ওঁকে চিনতে পেরেছিলো। ওর পরনে ছিলো শার্ট। ওকে নেয়ার সময় ওরা দুজন উপস্থিত ছিলো বলেই শার্ট দেখেই ওকে শনাক্ত করতে ওদের কষ্ট হয়নি।

মোমিন চিৎকার করতে করতে বাসায় ফিরেছিলো, পেয়েছি, সাহেবকে পেয়েছি। আমার কিছু বুঝে উঠবার আগেই ও একটা শাদা চাদর হাতে করে দ্রুত ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলো ওকে নিয়ে আসতে।

ওই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিলো, কী দুর্লভ এই পাওয়া! হারিয়ে যাওয়া মানুষটিকে আর একবার দেখা যাবে। কিন্তু দেখে বুঝেছি, না দেখাই ভালো ছিলো।

২০ ডিসেম্বর 'দৈনিক পূর্বদেশ' 'রক্তস্নাত বাংলাদেশ কাঁদো', 'মানবেতিহাসের জঘন্যতম অপরাধের বিচার চাই'–এই শিরোনাম দিয়ে লিখেছিলো :

"বাংলার মানুষ বিচার চায়। মানব ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের বিচার চায় এই দেশের কোটি কোটি মানুষ"।

"মাইলাই আর নুরেমবার্গ হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত অপরাধীদের বিচার করেছে বিশ্ববাসী। কিন্তু বাংলার বুকে ইয়াহিয়া, টিক্কা, নিয়াজিরা ঠাণ্ডা মাথায় সুপরিকল্পিতভাবে যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, তা মাইলাই ও ফ্যাসিস্ট জার্মানিতে অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ডের ইতিহাসকেও ম্লান করে দিয়েছে।

"হানাদার পাকিস্তানিদের নারকীয় উৎসবে ক্ষতবিক্ষত বাংলাদেশে সংঘটিত হয়েছে হাজার হাজার মাইলাই আর নুরেমবার্গ'।

"শোকে মুহ্যমান বাংলায় মানুষের মনে আজ প্রশ্ন, 'জেনেভা কনভেনশন' কার জন্যে? ইয়াহিয়া, টিক্কা, নিয়াজিরা কি এই কনভেনশনের আওতাধীন? আন্তর্জাতিক রেডক্রস কি বাংলার মানুষের এই প্রশ্নের উত্তর দেবে'?

"নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করা ছাড়াও এই নরপশুরা পরাজয়ের মুহূর্তে ধরে ধরে ডেকে এনে হত্যা করেছে শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার ও সাংবাদিকদের'।

"বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ধীরে ধীরে খবর আসতে শুরু করেছে। খুলনা, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর পদলেহী আলবদর বাহিনী চলতি মাসের প্রথম দুসপ্তাহ ধরে শত শত বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে'।

"বিভিন্নসূত্র থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে, শুধুমাত্র রাজধানী ঢাকা নগরীতেই হানাদার বাহিনী ও আলবদরের পশুরা তিন হাজার বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, ডাক্তার ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের হত্যা করার জন্য পরিকল্পনা করেছিলো"।

"প্রকাশ পেয়েছে যে, ডিসেম্বরের দশ তারিখে তারা এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১১ডিসেম্বর থেকে তারা প্রকৃত অভিযান শুরু করে। ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই পশুরা প্রায় তিনশ জন নামজাদা লোককে ধরে নিয়ে গেছে। এদের অনেকেই নিখোঁজ রয়েছেন। মাত্র কয়েকজনের মৃতদেহ পাওয়া গেছে'।

"বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সমূলে উৎপাটিত করার এই জঘন্য অভিযানের পেছনে কি উদ্দেশ্য কাজ করেছে? এটা কি বাঙালী জাতিকে পঙ্গু করার ষড়যন্ত্র"?

"বিশ্ববিবেক বাংলার মানুষের এসব প্রশ্নের কি উত্তর দেবেন?"

ওই পত্রিকাতেই 'এই হত্যাযজ্ঞের বিচার চাই' শিরোনামে লেখা হয়, "পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ও বাংলাদেশে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর পদলেহী বর্তমানে নিষিদ্ধ জামাতে ইসলামী নামে পরিচিত এক চরম ধর্মীয় ফ্যানাটিক দলের চণ্ড রাজাকার বাহিনীর আলবদর ও আলশামস ঢাকার যে বহুসংখ্যক বুদ্ধিজীবীকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিলো, তাদের প্রায় সকলকেই এই ঘাতক বাহিনীর লোকেরা খুন করেছে'।

"আজ পর্যন্ত আমরা বহু নৃশংস হত্যাকারীর নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের কাহিনী শুনেছি কিন্তু গত নমাসে বিশেষ করে গত সপ্তাহকালের মধ্যে (১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত) দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর দোসর জামাতে ইসলামীর আলবদর, আলশামস বাহিনী...যেভাবে অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে তার নজির কোথাও নেই।...বাংলার এই সকল সোনার সন্তানদের.. মৃতদেহগুলো দেখে চরম পাষণ্ডেরও দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলে আমরা বিস্মিত হবো না। নিদারুণ ও জঘন্যতম নির্যাতনের পরে তাদের প্রাণ কেড়ে নেয়া হয়েছে।...

"স্বাধীনতার এই উষাকালে আমরা যখন আনন্দোল্লাসে আকাশ প্রকম্পিত করে তুলেছি, ঠিক সেই সময়ে এদের হত্যার খবরে আমাদের আনন্দ, উল্লাস সবকিছুই স্তব্ধ

হয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতা অর্জনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ঘাতক জামাতে ইসলামীর চণ্ড বাহিনীর হাতে এই বুদ্ধিজীবীদের নিষ্ঠুরতম মৃত্যুবরণ আমাদের কাছে এক চরম আঘাত'।

"আজ তাই বিশ্বমানবতার কাছে আমাদের দাবি, ইতিহাসের এই নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞের হোতাদের বিচার চাই। স্বাধীনতার সাথে সাথে এইসব ভয়াল নিষ্ঠুর বর্বর ঘাতক জনসাধারণের সাথে মিশে যাওয়ার চেষ্টা শুরু করেছে। জনসাধারণকে তাই সাবধান হতে হবে। নিজ নিজ এলাকার ওপর প্রতিটি লোককে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এরা যেন পালাতে না পারে। এরা যেন রাজাকারের রাইফেল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাংলাদেশের জয়ধ্বনি দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে গিয়ে ভবিষ্যতের ক্ষতিসাধনের প্রচেষ্টা চালাতে না পারে। এদের ধরে যথাযথ কর্তৃপক্ষের হাতে অর্পণ করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক এ ব্যাপারে সজাগ থাকলে এদের আটকানো কষ্টসাধ্য হবে না এবং আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, নুরেমবার্গের ঐতিহাসিক বিচারের মত এইসব ঘাতকেরও বিচার করে সমুচিত শাস্তি দেয়া হবে।"

নমাসের নির্মম অত্যাচারের পর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে দেশের সমস্ত মানুষ এভাবেই তাদের অন্তরের ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। আমাদের প্রচণ্ড শোক এতে প্রশমিত হয়নি ঠিকই, কিন্তু যখন পত্রপত্রিকায় এ ধরনের অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে, অপরাধীদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তখন অন্ততপক্ষে মনে হয়েছে যে, হত্যাকারীরা রেহাই পাবে না। বাংলাদেশের মানুষ তাদের বিচার করবেই।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ, সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, মিটফোর্ড হাসপাতাল, স্নাতকোত্তর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এবং মেডিকেল এসোসিয়েশন পৃথক পৃথকভাবে চিকিৎসক হত্যার নিন্দা ও শোক প্রকাশ করেছে। এ সম্পর্কে 'দৈনিক পূর্বদেশ' তার ১৯ ডিসেম্বরের সংখ্যায় লিখেছিলো, "আজ সকাল ১১টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের বক্তৃতাকক্ষে এ কলেজের ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক ডাঃ ফজলে রাব্বি ও চক্ষু বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ আলীম চৌধুরীর মৃত্যুতে এক শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়"।

"ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ জনাব এস. আর. চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বিভিন্ন বক্তারা এই মহান চিকিৎসকদ্বয়ের পরলোকগমনে গভীর শোক প্রকাশ করেন। বক্তৃতাদানের সময় অধ্যাপক ডাঃ মোমিনুল হক, অধ্যাপক আলী আশরাফ, ডাঃ সালাউদ্দীন এবং অধ্যাপক আকরাম হোসেন গভীর কান্নায় ভেঙে পড়েন। অন্য বক্তাদের মধ্যে মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে বলেন ডাঃ সারোয়ার আলী (বাংলাদেশ মেডিকেল সমিতির সাধারণ সম্পাদক), রফিকুল হাসান (ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র সংসদের ভারপ্রাপ্ত সহ-সভাপতি) ও আবুল কাশেম"।

"সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ মাহবুবুর রহমান ও বিভিন্ন বক্তারা শহীদ চিকিৎসকদের জীবনাদর্শ অনুযায়ী গণমুখী চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীন

দেশের চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানান। তাঁরা শহীদ চিকিৎসকদের মূল লক্ষ্য অনুযায়ী শোষণমুক্ত সমাজ কায়েম করা এবং এ দেশের সর্বস্তরের মানুষের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য সকল চিকিৎসককে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করার আহ্বান জানান। সভায় ঢাকার মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসের দুটি শাখাকে যথাক্রমে অধ্যাপক আলীম চৌধুরী ছাত্রাবাস ও অধ্যাপক ফজলে রাব্বি ছাত্রাবাস হিসাবে নামকরণ করা হয়"।

"মরহুম চিকিৎসকদের পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করে তাদের প্রতি সর্বাত্মক সহযোগিতা এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতিসহ দুটি প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়"।

"সভার বিভিন্ন পর্যায়ে ডাক্তার, অধ্যাপক ও ছাত্ররা বক্তৃতার সময় বার বার কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং তাদের প্রিয় চিকিৎসক সহকর্মীদের লক্ষ্য তাদের কর্মজীবনে বাস্তবায়নের শপথ গ্রহণ করেন। সভায় মরহুম চিকিৎসকদের পরিবারের প্রতি গভীর শোক প্রকাশের এবং তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করার উদ্দেশ্যে আগামীকাল মরহুমদের কুলখানিতে অংশগ্রহণের জন্য সকলকে আহ্বান জানানো হয়।"

বিচারের প্রহসন

১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি জারি হয় 'বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অধ্যাদেশ ১৯৭২। দালালদের বিচারের জন্য এই আইনে দুবছরের জেল থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত শাস্তির বিধান রাখা হয়। এই আদেশ অনুযায়ী আসামির ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করার অধিকার থাকলেও ফরিয়াদিকে ট্রাইব্যুনালের বিচার্য অপরাধের জন্য অন্য কোনো আদালতের বিচার প্রার্থনার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

এ প্রশ্ন কি আমার অসঙ্গত কোনোকিছু, গণহত্যাকারী ও দালাল নেতাদের সুকৌশলে রক্ষার জন্যই প্রণীত হয়েছিলো এই আইন? কারণ আইনের ৭ ধারায় বলা হয়েছিলো, থানার ভারপ্রাপ্ত ও.সি. যদি কোনো অপরাধকে অপরাধ না বলেন, তবে অন্য কারও কথা বিশ্বাস করা হবে না, অন্য কারও অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার হবে না ট্রাইব্যুনালে। অন্য কোনো আদালতেও মামলা দায়ের করা যাবে না। দালালদের আত্মীয়স্বজনদের ও.সি-কে তুষ্ট করার মতো আর্থিক সামর্থ্য ঠিকই ছিলো, কিন্তু স্বজন হারানো নির্যাতিত দরিদ্র জনসাধারণের সেটা ছিলো না।

২৮ মার্চ দালাল আইনে বিচারের জন্য সারাদেশের সমস্ত জেলায় মোট ৭৩টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। দালাল আইনের ব্যবস্থা অনুযায়ী এই সমস্ত ট্রাইব্যুনালে যেসব অপরাধের বিচার করা হবে, তা অন্য যে কোনো আদালতের এখতিয়ার-বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হয়। এপ্রিল মাস থেকে দালাল আইনের আওতায় বিচারের কাজ শুরু হয়।

কিন্তু সত্যি বলতে কি এই আইন কুখ্যাত খুনি দালালদের রক্ষাকবচ হিসেবে দেখা দেয়। যে শান্তি কমিটির মূল কাজ ছিলো নিরপরাধ বাঙালিদের হত্যার তালিকা প্রস্তুত করা এবং তাদের হত্যার জন্য পাকসেনাদের সহায়তা করা, তার সদস্যরা সর্বোচ্চ সাত বছরের কারাদণ্ড পেয়ে নিস্তার পেয়ে যায়। শান্তি কমিটির নিজস্ব ঘোষণা অনুযায়ীই, এর মূল কাজ ছিলো, তাদের ভাষায় 'দুষ্কৃতকারী ও ভারতীয় চরদের তন্নতন্ন করে খুঁজে বের করে সেনাবাহিনীর সহায়তায় তাদেরকে নির্মূল করা', সুতরাং যেকোনো দালালের সর্বোচ্চ শাস্তি পাওয়ার জন্য তার শান্তি কমিটির সদস্য প্রমাণিত হওয়াই ছিলো যথেষ্ট।

১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর তারিখে তথাকথিত সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আগে অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত দালাল অধ্যাদেশে অভিযুক্ত মোট ৩৭ হাজার ৪শ' ৭১ জনের মধ্যে ২ হাজার ৮শ' ৪৮ জনের মামলার নিষ্পত্তি হয়েছিলো। এর মধ্যে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছিলো মাত্র ৭শ' ৫২ জন। বাকি ২ হাজার ৯৬ জন বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। এর মধ্যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় মাত্র একজন রাজাকারকে। সুতরাং, সহজেই প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে কি গণহত্যাযজ্ঞের সেই ভয়াবহ দিনগুলোতে দালালরা কোনো মানুষকে হত্যা করেনি? নির্যাতিত লক্ষ কোটি মানুষের জবানবন্দি তাহলে কি সবই ছিলো মনগড়া গল্প? নারকীয় বধ্যভূমিগুলোতে প্রাপ্ত বহুবিধ নৃশংস নির্যাতনের নিদর্শনসহ বিকৃত লাশগুলোর সবাই কি ছিলো শুধু বর্বর পাকসেনাদের শিকার?

দালাল আইনের অধীনে ট্রাইব্যুনালের বিচারও ছিলো প্রহসনমাত্র। একটি দৃষ্টান্ত এ প্রসঙ্গে দেয়া যেতে পারে। সাংবাদিক-সাহিত্যিক শহীদুল্লা কায়সারকে অপহরণের অভিযোগে যাকে সুনির্দিষ্ট প্রমাণসহ অভিযুক্ত করা হয়েছিলো, তাকে দেয়া হয়েছিলো মাত্র সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। আমারতো মনে হয়, শুধু মনেই হয় না, এটা এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, গণহত্যার উদ্দেশ্যে গঠিত শান্তি কমিটি, রাজাকার ও আলবদর, আলশামস ইত্যাদি বাহিনীতে যোগদানকারী ব্যক্তিদের এইভাবে লঘুদণ্ড দিয়ে কিছুকালের জন্য তাদের কারাগারের ভেতরে রেখে বিক্ষুব্ধ জনতা এবং তাদের হাতে নির্যাতিতদের রোষানল থেকে রক্ষা করার অজুহাতেরই নামান্তর ছিলো ওই ট্রাইব্যুনালে প্রদত্ত বিচারের রায় ইত্যাদি।

দালাল রক্ষার এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটি কুখ্যাত দালালদের তথাকথিত বিচার হওয়ার আগ পর্যন্ত জনসাধারণের কাছে ধরা পড়েনি। তবে সচেতন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী প্রথম থেকেই এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিলেন। এরপর যখন দেখা গেল সরাসরি গণহত্যার নেতৃত্বদানকারী দালালরা নামেমাত্র সাজা পেয়ে নিষ্কৃতি পাচ্ছে, তখন এ ব্যাপারে সচেতনতা আরো বৃদ্ধি পায়।

পরে বিভিন্ন মহলের প্রতিবাদের মুখে আওয়ামী লীগ সরকার বাধ্য হয় এ বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে দেখার।

এর পরের ব্যাপারতো আরো মর্মান্তিক। এমন ঘটনা আমার ধারণারও অতীত ছিলো। বাস্তবে দেখাতো দূরের কথা। ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর। এদিন আকস্মিক এক সরকারি ঘোষণা মারফত দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত এবং বিচারাধীন সকল আটক ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়।

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার এক সপ্তাহের মধ্যেই মালেক মন্ত্রিসভার সদস্যবর্গ, কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি এবং শান্তি ও কল্যাণ পরিষদের নেতৃবৃন্দ, জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, পিডিপি, নেজামে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ এবং বুদ্ধিজীবী হত্যার চক্রান্তকারী দালালসহ মূল স্বাধীনতাবিরোধীরা জেল থেকে বেরিয়ে আসে। আর এভাবেই

মানবেতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড যারা সংঘটিত করেছিলো, সেই উন্মত্ত খুনিদের আবার স্বজন হারানো জনতার কাতারে ফিরে আসবার সুযোগ করে দেয়া হয়।

শুধু তাই নয়, ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে নতুন সামরিক সরকারের তরফ থেকে একটি বিশেষ অধ্যাদেশ জারি করে দালাল আইন তুলে নেয়া হয়। এর আগের সরকারগুলো দালালদের পুনর্বাসনে ভূমিকা রাখলেও স্বাধীনতা-বিরোধী খুনিদের সরকারি কোনো উচ্চপদে বসায়নি। কিন্তু পরবর্তিকালে এইসব ধিকৃত খুনিকে অন্তর্ভুক্ত করে গঠন করা হয় রাজনৈতিক দল। শুধু তাই নয়, বেয়নেট চার্জ করে এবং লাইন করে দাঁড় করিয়ে নিরপরাধ বাঙালিদের যারা গুলির পর গুলি করে হত্যা করেছিলো, তেমন খুনিসহ বহু দালালকে মন্ত্রিসভারও সদস্য করা হয়।

এ লজ্জা, এ দুঃখ এবং মনের ভেতরকার এ পাহাড় সমান ঘৃণা কীভাবে প্রকাশ করবো, আমি জানি না। আমার ভাষা নেই।

১৯৭২-এর এপ্রিলের কোনো এক শনিবারের 'দৈনিক বাংলা'য় মৌলানা মান্নানের ছবিসহ এ রকমের একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিলোঃ

খুনী মৌলানা মান্নানকে ধরিয়ে দিন

কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রাক্তণ সাধারণ সম্পাদক, ইয়াহিয়ার প্রহসন উপনির্বাচনের প্রার্থী, নিয়াজী, ইয়াহিয়া, ফরমান গংয়ের দোসর, রাজাকার বাহিনীর সংগঠক, কুমিল্লা জেলার ফরিদগঞ্জ থানার আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল মজিদ ও পুরানা পল্টনস্থ ডাক্তার আলীম চৌধুরীসহ অসংখ্য বাঙালি হত্যার নায়ক মৌলানা আবদুল মান্নান আজো ধরা পড়েনি।

সে পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে টেলিভিশনেও ভাষণ দিয়েছে। সে এখনও আত্মগোপন করে আছে। তাকে ধরিয়ে দিন।

একাত্তরের ১৭ ডিসেম্বর আমরাই তাকে রমনা থানায় সোপর্দ করেছিলাম। অজ্ঞাত কারণে তাকে রমনা থানা থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। পত্রপত্রিকায় মৌলানার ছবিসহ বিজ্ঞপ্তি বের হওয়ার পর আরেকবার মুক্তিযোদ্ধারা তাকে ধরে থানায় নিয়ে যায়।

'৭৫-এর পটপরিবর্তনের পর মৌলানা মান্নানের ক্রম উত্থান ঘটে। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষকদের নিয়ে জমিয়াতুল মোদাস্সেরিন গঠন এবং এক পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতা হিসেবে। তিনি শিক্ষকদের সরাসরি রাজনীতির সাথে জড়িত করে গুছিয়ে নেন নিজের আখের। এর প্রমাণ তার বর্তমান বিত্ত আর বৈভব এবং ক্ষমতার মদমত্ততা।

এক পর্যায়ে মৌলানা মান্নান বিএনপিতে যোগ দেন এবং নির্বাচিত হন পার্লামেন্টের সদস্যও। সাত্তার সরকার তাকে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য করেন। উল্লেখ্য, তখন পূর্ণ শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন স্বাধীনতা-বিরোধী নেতাদের অন্যতম প্রধান শাহ আজিজুর রহমান। দুই স্বাধীনতা-বিরোধীর এক পতাকাতলে মিলিত হবার নেপথ্যে বিদেশী শক্তির ইঙ্গিত ছিলো বলে সন্দেহ করা হয়।

এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, বিএনপি সরকারের পতনের পর মৌলানা মান্নান স্বৈরাচারী এরশাদেরও আস্থাভাজন হবার চেষ্টা করে সফল হন এবং তার সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য হয়ে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে অসম্ভব তৎপর ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্মমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। এরপর তাঁকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন দফতরের মন্ত্রীও করা হয়।

"পরবর্তীকালে মৌলানা মান্নানের অনেক কাজ প্রোটোকল পরিপন্থী হওয়ায় তাকে মন্ত্রিপরিষদ থেকে বাদ দেয়া হয়।" [মওলানা মান্নানের মুখ ও মুখোশ, সাপ্তাহিক এখনই সময় ২০-২৭ জুন, '৮৮।]

'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়' গ্রন্থে মৌলানা মান্নান সম্পর্কে আরো লেখা হয়ঃ

"ধর্মমন্ত্রী মওলানা মান্নানও স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় তাঁর ভূমিকা চেপে রাখতে তৎপর। সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত 'খোঁচান ক্যান, কিসের বিতর্কিত আমি?' শিরোনামে একটি সাক্ষাৎকারের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন তিনি এই বলে, তিনি কোনো শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন না বা স্বাধীনতা-বিরোধী কোনো বিবৃতিও দেননি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় মওলানা মান্নান ছিলেন বাঙালিদের জন্য ত্রাসস্বরূপ।

"এপ্রিল ১৯৭১ সালে তাকে শান্তি ও কল্যাণ কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় পরিষদে 'কো-অপ্ট' করা হয়। পাকবাহিনীর গণহত্যাকে সমর্থন করে বিবৃতিও দিয়েছেন বেশ কয়েকবার। এর মধ্যে ১৯৭১ সালের ২৭ এপ্রিল প্রকাশিত তার বিবৃতির একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলো। সেখানে তিনি বলেন, সন্ত্রাস, অনুপ্রবেশকারী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমূলে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক জনগণ আজ 'জেহাদের জোশে' আগাইয়া আসিয়াছে। জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় আমাদের সাহসী সশস্ত্র বাহিনী সকল অঞ্চলে দখল কায়েম করিয়া সুদৃঢ়ভাবে তাহাদের কর্তৃত্ব কায়েম করিয়াছে।

"২৭ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তান মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সভাপতি মওলানা মান্নানের নেতৃত্বে মাদ্রাসা শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধিদল 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক এবং পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের কমাণ্ডার লেঃ জেঃ এ. এ. কে. নিয়াজীর সাথে সাক্ষাৎ করে।

"জেনারেল নিয়াজীকে এক কপি কোরান শরিফ উপহার দিয়ে মওলানা মান্নান বলেন, 'পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও ইসলামের গৌরব বৃদ্ধির জন্য আমরা সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।' প্রত্যুত্তরে জেনারেল নিয়াজী বলেন, ওলামা, মাদ্রাসা শিক্ষক এবং অপরাপর দেশপ্রেমিক নাগরিকরা যোগাযোগ মাধ্যমগুলো রক্ষা ও রাষ্ট্রবিরোধীদের নির্মূল করতে পারে। ভারতীয় চরদের মোকাবেলা করার জন্য গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মতো স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের ক্ষেত্রে জেনারেল নিয়াজী তাদেরকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

'এই বৈঠকের পর মাদ্রাসা শিক্ষক ও ছাত্রদের রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে সামরিক ট্রেনিংদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।'

"প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ আলীম চৌধুরীর হত্যায় মৌলানা মান্নানের হাত ছিলো বলে অভিযোগ রয়েছে। ২৯/১, পুরানা পল্টনে ডাঃ আলীম চৌধুরীর দোতলা বাড়ির একতলায় তার ক্লিনিক ছিলো। প্রতিবেশী দালাল প্রাক্তণ ডেপুটি স্পিকার এ. টি. এম. এ মতিন জোর করে ক্লিনিক তুলে দিয়ে সেখানে মওলানা মান্নানকে ভাড়া দিতে ডাঃ আলীমকে বাধ্য করেছিলেন।"

"ইতিপূর্বে ডাঃ চৌধুরী এ ধরনের একটা কিছু আঁচ করে বার বার বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মওলানা মান্নান তাঁকে বাড়ি ছেড়ে যেতে বাধা দেন। নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে মওলানা মান্নান বলেন, ব্রিগেডিয়ার বশির, ক্যাপ্টেন কাইয়ুম এরা তার বন্ধু। আলবদরের ছেলেরা তার ছাত্র। যদি তারা আসে তা হলে তাকে যেন খবর দেয়া হয়।"

লুঙ্গি পরা অবস্থায় আলীম চৌধুরী নিচে নেমে মওলানা মান্নানের দরজায় ধাক্কা দিতে থাকেন। এমনিতে তাঁর দরজা সব সময় খোলা থাকতো কিন্তু সেদিন ছিলো বন্ধ। ডাঃ চৌধুরী ক্রমাগত অসহিষ্ণুভাবে দরজা ধাক্কাতে ধাক্কাতে মওলানাকে চিৎকার করে ডাকতে থাকেন। বেশ কিছুক্ষণ পর মওলানা মান্নান ভেতর থেকে বলেন, 'ভয় পাবেন না। আপনি যান, আমি আছি।'

"পরে রায়েরবাজারের বধ্যভূমি থেকে তাঁর গলিত, বিকৃত লাশ উদ্ধার করা হয়।"

[একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়'-মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত। ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭।]

"মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-বিরোধী প্রায় সব লোকই স্বাধীনতার পর ভোল পাল্টে অবস্থান পরিবর্তন করেছে। বাংলাদেশে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ভিড়ে মিশে গেছে; কিন্তু একবিন্দুও ভালোবাসেনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষদের। গত বিশ বছর ধরে এরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দেশ থেকে অবলুপ্ত করার জন্য নানারকম হীন চক্রান্ত করে আসছে। এখন তারা আরো দারুণভাবে সক্রিয়।

তাদের এই চক্রান্তের কারণেই আমাদের বর্তমান প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক মূল্যায়ন তুলে ধরা যায়নি। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী, মুক্তিসংগ্রামীদের পরিচয়, শহীদ বুদ্ধিজীবী এবং অসংখ্য মা-বোনের আত্মত্যাগের কথা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবেশন করা হয়নি, যার ফলে আজকের প্রজন্মের অনেকেই মহান মুক্তিযুদ্ধকে বলে 'গোলমালের সময়' এবং 'বুদ্ধিজীবী দিবস' কি জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতে পারে না।

মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী জানে না বলেই মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি কোনো শ্রদ্ধাবোধ এদের ভেতরে জাগ্রত হয়নি। আমাদের দেশের অগণিত মানুষ কীভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়েছিলো, কী অমানবিক কষ্ট আর যন্ত্রণা ভোগ করে তারা দেশকে শত্রুমুক্ত করেছিলো, এ কথা এখনকার ছেলেমেয়েরা ভালোভাবে জানে না। তাদের জানানোর তেমন কোনো প্রয়াসও নেই। বরং আছে এর উল্টোটি।

স্বাধীনতা-বিরোধীরা তাদের চক্রান্তের জাল এমনভাবে সুকৌশলে বিস্তৃত করেছে যে, তারা সমাজে চিহ্নিত ব্যক্তি হয়েও ধিকৃত নয় বরং ক্ষেত্রবিশেষে আদৃত। এরা ভোটে জয়ী হয়ে জাতীয় সংসদের সদস্য হয়। অতীতের কৃতকর্মের জন্য তারা বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা দুঃখিত নয়, বরং তারা মনে করে, একাত্তরে তারা কোনোরকম ভুল করেনি।

অতীতে ফেরা

এক বোন আর তিন ভাইয়ের মধ্যে আলীম ছিলো তৃতীয়। ওর ডাকনাম ছিল টুনু। বাবা আবদুল হেকিম চৌধুরী এই সন্তানের প্রতি বড়ো বেশি দুর্বল ছিলেন। এমনিতে ছেলেমেয়েদের কোলেপিঠে করার অভ্যেস তাঁর মোটেই ছিলো না। কিন্তু তৃতীয় সন্তানের টান তিনি এড়াতে পারেননি।

অফিস থেকে ফিরেই কোলে নিতে হতো তাকে। না নিলে জড়িয়ে ধরে থাকতো সে। তাই বাধ্য হয়েই কোলে তুলে নিতেন তিনি। মাঝে-মধ্যে স্ত্রীকে বলতেন, তোমার এই ছেলে আমার কোমর বাঁকা করে ফেললো।

অবিভক্ত বাংলায় এ অঞ্চলের জেলা স্কুল পরিদর্শক ছিলেন আবদুল হেকিম চৌধুরী। এখনকার কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম থানার খয়েরপুর গ্রামে ছিলো তাঁদের পৈতৃক জমিদারি। বাপ-দাদার আমলের জমিদারির ভগ্নদশার শেষ অবস্থায় তাঁর জন্ম। বড় হয়ে গ্রামের মানুষজনের শ্রদ্ধা ভালবাসা ছাড়া আর কোনোরকম সুবিধে পাননি তিনি বরং কঠোর জীবন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে গড়ে তুলেছেন নিজেকে।

বড় বোনের শ্বশুরবাড়িতে মানুষ হয়েছেন। কোলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করে সরকারি চাকরিতে ঢুকেছেন। কৃচ্ছ্রসাধন করে হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে হয়েছেন সচেষ্ট। সন্তানদের জন্য সচ্ছলতা এনেছেন সংসারে। কিন্তু কঠোর শাসনে মানুষ করেছেন সবাইকে। তাই অসংযমী বা বেহিসেবি হবার সুযোগ পায়নি কেউ। আবদুল হেকিম চৌধুরীর চরিত্রের স্পষ্টবাদিতা ও সততা সবাইকে মুগ্ধ করতো। ধর্ম ও সাহিত্যচর্চায় সময় ব্যয় করতে ভালোবাসতেন। লেখক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন 'কয়েকজন মুসলমান লেখক' শিরোনামে এক রচনায় লিখেছেন, "আবদুল হেকিম চৌধুরী কিশোরগঞ্জ মহকুমার একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে। তিনি শিক্ষা জীবন পরিসমাপ্তির পর শিক্ষা বিভাগে চাকরি লাভ করেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়সমূহের জেলা ইন্সপেক্টররূপে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে স্বীয় কন্যার গৃহে মগবাজারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।"

সাহিত্যের প্রতি ছিলো তাঁর গভীর দরদ। তিনি কবিতা ও প্রবন্ধ রচনায়ও ছিলেন পটু। 'উচ্ছ্বাস' ও 'শোকোচ্ছ্বাস' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং 'হযরত মুহম্মদের (সঃ) জীবনী' ইত্যাদি তাঁর সাহিত্য কৃতি। ইংরেজিতে তিনি 'Antiquitics of Gour and Pandua' প্রভৃতি রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থ দুটো এখনো প্রকাশিত হয়নি। পাণ্ডুলিপি আকারেই রয়ে গেছে।

উত্তরাধিকার সূত্রে বাবার অনেক গুণই পেয়েছিলো আলীম। সেই সাথে ছিলো ওর নিজস্ব জেদ। আবদুল হেকিম চৌধুরীকে অতি আদরের এই জেদি ছেলের কাছে বহুবার হার মানতে হয়েছে।

একবার আবদুল হেকিম চৌধুরী তাঁর চাকরিস্থল মালদহ শহরে খুব বিপদে পড়েছিলেন। অফিস থেকে বাসায় ফিরে শোনেন, আলীম হারিয়ে গেছে। তখন ও মাত্র চার বছরের। ছুটে বেরিয়ে গেলেন সোজা রাস্তা ধরে বাজারের দিকে। অনেকটা পথ এসে এক জায়গায় ভিড় দেখে এগিয়ে গেলেন। দ্যাখেন, ছোট্ট আলীম কাঁদছে অঝোরে। কেউ তাকে ছুঁতে পারছে না। ধরতে গেলেই আরো জোরে চিৎকার করে উঠছে। চারপাশে ভিড় করে আছে লোকজন।

ভিড় সরিয়ে এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়াতেই তাঁর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো ছেলে। সকলেই বুঝলো, ইনিই ওর বাবা। না হলে আর কারো কাছেই না গিয়ে তাঁর কাছেই বা যাবে কেন!

আলীম তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত নিজের গ্রামের স্কুলেই লেখাপড়া করেছে। এরপর তাকে বর্তমান কিশোরগঞ্জ শহরের কিশোরগঞ্জ হাইস্কুলে ভর্তি করা হয়। থাকার ব্যবস্থা হয়েছিলো চাচাতো বোনের বাড়িতে। কিন্তু আলীম মন থেকে গ্রহণ করতে পারেনি এই ব্যবস্থা। তাই ও একবার বিদ্রোহ করে বসে। কারো বাড়িতে থাকবে না। হোস্টেলে দিতে হবে, না হলে পড়াশোনা ছেড়ে দেবে এই ছিলো ওর মনোভাব।

বাবা বাধ্য হয়েই শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। হোস্টেলে আলীম যেতে পারলো ঠিকই; কিন্তু বলা হলো, যে মাসিক খরচ হবে, তার পাই-পয়সার হিসেব তাকে মাসের শেষে দেখাতে হবে। দু'তিন মাস দেখানোর পরই আলীম আবার বেঁকে বসলো। একাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার চাইতে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে মূর্খ হয়ে ঘরে বসে থাকাই অনেক ভালো। কী আর করা, ছেলের হুমকির কাছে শেষে আত্মসমর্পণ করতে হলো কড়া মেজাজের বাবা হেকিম চৌধুরীকে।

স্পষ্টবাদী আলীম উচিত কথা বলতে কখনও দ্বিধা করেননি। তাই পরিবারের সবাই তাকে সমীহ করে চলতো। যেকোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার বেলায় তার মতামতই ছিলো চূড়ান্ত।

সত্য বলার সাহস তার ছোটবেলা থেকেই ছিলো। ম্যাট্রিক পাস করার পর কোলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে আইএসসি পড়ার সময় ওর বড় ভাই আবদুল করিম

চৌধুরীর বিয়ে ঠিক হয়। কোলকাতায় ওর বড় বোন ও দুলাভাই ছিলেন। তারা বিয়ের জন্য বেশকিছু আসবাবপত্র দিয়ে আলীমকে বাড়ি পাঠালেন। নৌকোয় করে আসবার সময় পথে হলো ডাকাতি। সব জিনিসপত্র ডাকাতরা নিয়ে যায়।

আলীম এই ঘটনার মুখে দমে যাওয়া বা ভয় পাওয়াতো দূরের কথা, বাড়ি না এসে অষ্টগ্রামে নেমে সোজা থানায় গিয়ে হাজির হলো। দায়ের করলো এজাহার। কয়েকদিনের মধ্যেই ধরা পড়লো ডাকাতরা। ওদের শনাক্ত করতে ওর মোটেও কষ্ট হলো না। জীবনের ওপর এই রকম ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে অনেক বলে-কয়েও ওকে সেদিন নিবৃত্ত করা যায়নি। কেবল ডাকতাদের শাস্তি হওয়ার পরই ও ক্ষান্ত হয়েছিলো। বিচারে ডাকতাদের জেল হয়ে যায়।

আইএসসি পাস করে আলীম ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়। ১৯৪৮ সালে। এখানে ভর্তি হবার পরপরই ও বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনে ক্রমশই জড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৯৪৮ সালে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের যে ধর্মঘট হয়, ও তাতে রেখেছিলো সক্রিয় ভূমিকা। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনেও ওর ভূমিকা ছিলো উল্লেখযোগ্য।

ডাঃ মোহাম্মদ মহিউদ্দীন খান 'বাইশ বছর আগেকার সেই স্মৃতি এবং সেই শহীদ মিনার' শিরোনামে একটি লেখায় আলীমের কথা তাঁর স্মৃতিচারণ সূত্রে এইভাবে লিখেছিলেন, আমরা তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র। হোস্টেলে থাকি। কয়েকশ' তরুণ দেশের একমাত্র চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র। আজ থেকে বাইশ বছর আগেকার কথা।...

"আজ যেখানে বড় বড় দ্বিতল, ত্রিতল ইমারত, সেখানে তখন ছিলো মুলি বাঁশ আর চাটাইয়ের বেড়া দেয়া ছনের আচ্ছাদনের কিছু অ্যাসবেস্টস টিনের চালাঘর মিলিয়ে মোট কুড়িটা ব্যারাক। কোনটাতে আবার সিলিং ছিলো না।

"অপরিসর কামরাগুলোর প্রতিটিতে তিনজন করে ছাত্রের বাস। গরমের দিনে অসহ্য গরম আর শীতের দিনে প্রচণ্ড শীতকে উপেক্ষা করে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনায় কয়েকটি বছর কাটিয়েছি আমরা এক সাথে। আমি ও আমার সেদিনের বন্ধুরা। আলীম (শহীদ ডাক্তার আলীম চৌধুরী), মর্তুজা (শহীদ ডাক্তার মর্তুজা, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল অফিসার), নওশের (শহীদ ডাক্তার নওশের) ছিল আমার একান্ত আপনজন।

"মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ১৩/২-এ ছিলাম আমি এবং নওশের। আলীম ছিলো ১২ নম্বর ব্যারাকের ছয় নম্বর রুমে।

"সেদিন ছিল ২১শে ফেব্রুয়ারি। পূর্ব পাকিস্তানের পরিষদ অধিবেশন চলছিল। সেদিনের ভাষা আন্দোলনকে নস্যাৎ করার চক্রান্তে আগেই ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সেদিন ভোরবেলা থেকেই শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছিল সবার মধ্যে। আমাদের মধ্যেও। ...

"আমাদের হোস্টেল প্রাঙ্গণটি একটি জনসমুদ্র হয়ে উঠলো। ডাঃ আলীম চৌধুরীর রুমের (১২/৬) ইটের গাঁথুনি বুলেটে ফুটো হয়ে গেছে। শহীদ আলীম '৫২ সালে

মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের নেতৃত্ব দিয়েছিল। আমার রুমের (১৩/৫) ভেতর দিয়েও গুলি চলে গিয়েছিল। বুলেটের ফুটোর চারদিকে সাদা চকের বৃত্ত এঁকে মোটা করে তার নিচে চিহ্ন দিয়ে রেখেছিলাম। মনে আছে, আলীম সবাইকে ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিল। দেশী-বিদেশী সাংবাদিকেরা সেই বুলেট চিহ্নের ছবি তুলে নিচ্ছিলেন।"

পূর্ব পাকিস্তান সরকার ১৯৫৪ সালে আলীমকে গ্রেফতার করে শহীদ দিবসে পতাকা উত্তোলনের সময়। ওর সঙ্গে আরও কয়েকজন ধরা পড়ে। সরকার মুচলেকা দিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব দেয়; কিন্তু আলীম এবং অনেকেই সেটা করতে অস্বীকার করে। প্রায় একমাস ওদের জেলে থাকতে হয়।

আলীম এম.বি.বি. এস পাস করে ১৯৫৫ সালে। ইন্টার্নিশিপ শেষ করে পাকিস্তান মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলে রিসার্চ এ্যাসিসটেন্ট হিসেবে কাজ করে।

১৯৫৮ সালের ১০ ডিসেম্বর উচ্চশিক্ষার জন্য আলীম যুক্তরাজ্যের পথে রওনা হয়। সে সময় ও পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশনের (পূর্ব পাকিস্তান শাখা) যুগ্ম সম্পাদক এবং পূর্ব পাকিস্তান মেডিকেল জার্নালের সম্পাদক।

যুক্তরাজ্যের লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি.ও করার সময় আলীম বিভিন্ন হাসপাতালে কর্মরত ছিলো। মুরফিল্ডের চক্ষু হাসপাতালে এক বছর অনারারি ক্লিনিক্যাল এ্যাসিসটেন্ট হিসেবে কাজ করার পর ব্র্যাডফোর্ডের রয়াল আই এ্যান্ড ইয়ার হাসপাতালে সিনিয়র হাউস অফিসার হিসেবে কাজ করেছে। এখানে এক বছর থাকার পর ওখানকার হুইপস ক্রস হাসপাতালে চক্ষু বিভাগের রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হয়।

এরপর আলীম লন্ডনের সেন্ট জেমস হাসপাতালে কাজ করে ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৩-র নভেম্বর পর্যন্ত। ডি.ও করা শেষ হয় ১৯৬১-র জানুয়ারিতে। লন্ডনে থাকার সময়ই মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতালে কাজ করার আমন্ত্রণ পায়। কুমুদিনী হাসপাতালের চাকরি নিয়ে ১৯৬৩-র ডিসেম্বরে আলীম ফিরে আসে দেশে।

লন্ডনে থাকার সময় আলীম সেখানকার বাংলা ভাষাভাষী অধিবাসীদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্র তৈরির জন্য 'বাংলা একাডেমি' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। সেখানকার উৎসাহী বাঙালিরাও ওর সাথে ছিলেন। এই একাডেমির আহ্বায়ক ছিলেন দু'জন—জলীল ভূঞা এবং আলীম চৌধুরী। ২৪, গ্রেট উইন্ড মিল স্ট্রিটে (ডবলিউ-১) ১৯৬২ সালের ২৬মে, শনিবার বিকেল চারটায় বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার জন্য এক সভা ডাকা হয়। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মরহুম এ. কে. নাজমুল করিম।

১৯৬২-র ১৬ জুন, শনিবার সেখানকার 'ইস্টার্ন হেরাল্ড' পত্রিকায় 'Bengali Academy Formed' এই শিরোনামে এ খবরটি উঠেছিলো:

"Bengali-speaking population of London has setup a Bengali Academy at a largely attended meeting of the students, youths,

working population and business community. the inaugural meeting was chaired by Professor Nazmul Karim, head of the Department of Sociology of the Dacca University. Fund valued at about two thousand Pakistani rupees was raised at the meeting to meet the incidental expenses in connection with the setting up of the institution. The Academy will have a reading room and library at 24, Great Windmill Street, Piccadilly Circus, London. The Academy hopes to introduce Bengali literature from East Pakistan to the western audience through translations. Besides, the Academy wants to sponsor literary and cultural activities among the Bengali speaking population. A committee has been formed with Professor Nazmul Karim as President, Dr. Alim Chaudhury as Secretary and seven other members to look after the interest of the Academy."

বাংলা একাডেমির উদ্বোধনী ভাষণে আলীম বলে, "পূর্ব পাকিস্তানিদের মিলনস্থল হিসেবে একাডেমি আমাদের নিজেদের মধ্যে চেনা-শোনা ও ভাবের আদান-প্রদান করতে সাহায্য করবে। এর ফলে আমাদের মধ্যে সমঝোতা ও একাত্মবোধের সৃষ্টি হবে।

"এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বলে পারছি না। আমাদের সমাজের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোকদের অধিকাংশই সমাজের প্রতি তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন নন। সেজন্যেই দেশের আজ এই অবস্থা। আমাদের দেশে বিত্তশালী লোকের অভাব নেই।... সবাই নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কেউবা লেখাপড়া, কেউ বা চাকরি নিয়ে। কেউ ছাত্র, কেউ ডাক্তার, উকিল বা ব্যবসায়ী। কিন্তু এর বাইরেও আমাদের একটা পরিচয় আছে। সেটা হলো এই যে, আমরা সবাই মানুষ। মানুষ হিসেবে সমাজের প্রতিও আমাদের একটা কর্তব্য আছে। সে কর্তব্যটা আমরা কজন পালন করছি! আমরা কজন দেশের জন্য কতটুকু সময় ব্যয় করছি!

"আমি এখানে আমাদের লেখাপড়া বা নিজের কাজ ছেড়ে হৈচৈ করতে বলছি না। নিজের কাজ বজায় রেখেও আমরা আমাদের অবসর সময়ের কিছুটা অংশ গঠনমূলক কাজে ব্যয় করতে পারি। এইভাবেই মানুষ হিসেবে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারি। একটু বিলাস বিসর্জন করে কিছুটা অর্থ দেশের কাজে ব্যয় করতে পারি।

"শুধু দেশের কথা ভাবলেই চলবে না। দেশের জন্য আত্মত্যাগ করতেও শিখতে হবে। আত্মত্যাগ ছাড়া কখনও কোন জাতি বড় হতে পারে না। আত্মত্যাগতো দূরের কথা আমরা আমাদের জাতির প্রতি সামান্য কর্তব্যটুকুও পালন করি না। এখন সময় এসেছে, সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা দেশের উন্নতির কাজে আত্মনিয়োগ করার। দেশের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করতে হলে দেশকে ভালো করে জানতে হবে। দেশের

সমস্যাগুলো বুঝতে হবে এবং প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধেও ভাবতে হবে।" বিদেশের মাটিতে বসেও ওর স্বাভাবিক চরিত্রজাত বৈশিষ্ট্য এতোটুকু ম্লান হবার সুযোগ পায়নি।

আলীম নিজেই বাংলা একাডেমির গঠনতন্ত্র তৈরি করেছে। একাডেমিতে নিয়মিতভাবে সাহিত্যসভা, গুণীজন সংবর্ধনা, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শহীদ দিবস পালন করা হতো। লন্ডনে বাংলা একাডেমি গঠনের উদ্যোগকে ওখানকার অন্যান্য সংগঠনও অভিনন্দন জানায়। পাকিস্তান ক্যাটারারস এসোসিয়েশন, ইস্ট পাকিস্তান মেডিকেল সোসাইটি এবং পাকিস্তান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানও চিঠি দিয়ে এদের উৎসাহিত করে।

একাডেমির উদ্যোগে প্রথম ২১ ফেব্রুয়ারি উদযাপিত হয় ব্যাপকভাবে। এই উপলক্ষে আলীম সুচিন্তিত ভাষণ প্রদান করে। তার মধ্যে কিছু প্রস্তাবও ছিলো। ভাষণে আলীম বলে, "১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাভাষাকে মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বুকের রক্ত দিয়ে যারা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে গেছেন, সেই সব শহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার উদ্দেশে আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি।

"শহীদ দিবস আমাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ মূলত দুটো কারণে:

১. নিজেদের আদর্শের জন্য প্রয়োজন হলে আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। শহীদদের ত্যাগ শুধু যে আমাদের দাবি আদায়ে সাহায্য করছে, তাই নয়—তাদের ত্যাগের এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অসংখ্য দেশপ্রেমিককে যুগে যুগে অনুপ্রেরণা দেবে।

২. যেকোনো দেশের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে। শুধু ভাষার প্রশ্নে নয় অন্য যেকোনো ব্যাপারে কোন জাতির উপর কেউ কিছু জোর করে চাপিয়ে দিতে পারে না। সাময়িকভাবে দমিয়ে রাখা সম্ভবপর হলেও শেষ পর্যন্ত জনমতেরই জয় হবে। আর তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ২১ ফেব্রুয়ারি।

"শহীদের আত্মত্যাগের ফলে ভাংলাভাষা আজ পাকিস্তানে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু সেটা কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ। কার্যক্ষেত্রে বাংলাভাষা এখনও মর্যাদার আসন লাভ করতে পারেনি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আজও অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, সভা-সমিতি, পার্লামেন্ট, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশী ভাষার সাহায্য নিতে হয়।"

"গত পনেরো বছরের এই অবস্থা পরিবর্তন করার কোন সরকারী প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। আমি জানি একদিনে এর পরিবর্তন সম্ভবপর নয়। কিন্তু পরিবর্তনের কাজ এখনই শুরু করা প্রয়োজন। একদিনও বিলম্ব করার অবকাশ নেই। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সেই সদিচ্ছা আছে কি?"

"আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ভাষা আন্দোলন থেমে যায়নি। এখনও চলছে এবং ততদিন চলবে, যতদিন না আমরা বাংলাভাষাকে জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে ব্যবহার করতে পারছি।"

আলীম শ্রোতৃমণ্ডলীর বিবেচনার জন্য যেসব প্রস্তাব উত্থাপন করে তার মধ্যে ছিলো:

"বাংলাভাষাকে সমস্ত অফিস-আদালতের সরকারি ভাষা হিসেবে প্রবর্তন করবার জন্য পাকিস্তান সরকারের নিকট দাবি জানাচ্ছে।

"এই সভা বাংলাভাষাকে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি স্তরে বিশেষভাবে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আশু ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছে।

"এই সভা ঢাকাস্থ বাংলা একাডেমিকে পরিভাষা সৃষ্টির কাজ ত্বরান্বিত করবার ও পরিভাষাকে জনপ্রিয় করবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বাংলা সাময়িকী প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে।

"এই সভা ঢাকাস্থ বাংলা কলেজের প্রতি সরকারের ঔদাসীন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং কলেজের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাবি জানাচ্ছে।

"এই সভা শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র সরকারি উদ্যোগে বাংলা পুস্তকাগার ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠার জন্য দাবি জানাচ্ছে।"

লণ্ডনের বাংলা একাডেমিতে পাঠাগার ছিলো। সেখানে বাংলা বই ও পত্রপত্রিকা ইত্যাদি পাঠের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। এছাড়াও বাঙালি লেখকদের লেখা ছোটগল্প ইংরেজিতে অনুবাদ করে ছাপানোর উদ্যোগও সেখানে গ্রহণ করা হয়েছিলো। তখনকার পাকিস্তানি হাইকমিশনারের কাছে আলীম চিঠি দিয়ে এ সমস্ত কাজে তাদের সাহায্য করার জন্য অনুরোধও জানিয়েছিলো।

স্মৃতিময় দিনগুলো

আলীম দেশে ফিরে আসে ১৯৬৩ সালে। মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতালে চক্ষু বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগদান করে।

এর মাস তিনেক আগে এম.এ. প্রথম পর্বের পরীক্ষা দিয়ে আমি মির্জাপুর ভারতেশ্বরী হোমসে শিক্ষিকা হিসেবে চাকরি নিই।

আলীমের ওখানে যাবার কয়েকদিন আগ থেকেই জনরব শুনছিলাম যে, একজন নামকরা চক্ষু চিকিৎসক আসছেন হাসপাতালে। স্বাভাবিকভাবেই এই নামকরা ডাক্তারকে দেখার আগ্রহ ভেতরে ভেতরে অবশ্যই ছিলো; কিন্তু কবে, কখন আসছেন, সে খোঁজ আর নেয়া হয়নি।

সামনে আমার এম.এ. ফাইনাল পরীক্ষা। চাকরিতে আছি বলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতে পারিনি। কিন্তু পরীক্ষা দেয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছি। এদিকে হোমসের উদয়াস্ত খাটুনি। ক্লাসে পড়ানো থেকে শুরু করে বিকেলের স্টাডি ডিউটি, মির্জা হলের নাটকের মহড়ায় মেয়েদের তদারকি। সবকিছু সেরেটেরে রাত জেগে পড়া তৈরি করি।

এর মধ্যে আমার এক মামা হাসপাতালে ভর্তি হতে এলেন চিকিৎসার জন্য। আমি যেহেতু ওখানে আছি, সেজন্যে মামা ও মামাতো ভাইরা আমার ওপর নির্ভর করেই কুমুদিনী হাসপাতালে এলেন। বিরাট এক দায়িত্ব ঘাড়ের ওপরে এসে পড়লো। ছুটোছুটি করে মামাকে ভর্তি করানো হলো। তাঁর একটা বড় অস্ত্রোপচার হলো, প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডে।

স্কুল শেষে দেখতে যেতাম মামাকে। পনেরো-ষোল দিনের মাথায় মামা সেরে উঠলেন। একদিন তাঁকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করছিলাম মামাতো ভাইয়ের সাথে। তিনতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে। ও বললো, ওই দ্যাখ, সেই ডাক্তার, যার নাম কয়েকদিন আগে শোনা গিয়েছিলো।

তাকিয়ে দেখলাম, বাইরের গেট থেকে কোয়ার্টারের দিকে যাচ্ছেন ডাঃ আলীম চৌধুরী। মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটছেন এক মনে। দেখে মনে মনে ভাবলাম, এতো নামকরা ডাক্তার, শরীরে এতো ছোট কেন?

আলীম ওরকমই ছিলো। কখনও ওর আসল বয়স ধরা যেতো না। ঘন কুচকুচে একমাথা চুল আর মাঝারি গড়ন ছিলো ওর। প্রকৃত বয়স থেকে সবসময়ই আট-দশ বছর কম মনে হতো।

এর অনেকদিন পর দ্বিতীয়বার দেখা হয় ওর সাথে জেঠামণির ওখানে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে। প্রয়াত রণদাপ্রসাদ সাহাকে আমরা জেঠামণি বলে ডাকতাম। তিনি রোববার মির্জাপুরে তাঁর নিজের বাড়িতে থাকতেন এবং দুপুরে আহার করতেন অনেককে সঙ্গে নিয়ে। পালা করে তিনি ডাক্তার, নার্স, শিক্ষক ছাত্রদের তাঁর সঙ্গে আহারের জন্য ডেকে পাঠাতেন।

এক রোববারে আমাদের কয়েকজন শিক্ষিকার ডাক পড়লো। সময়মতো খেতে গেলাম। গিয়ে দেখি, ওখানে তাঁর সঙ্গে খাবার টেবিলে বসে আছেন ডাঃ এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী, ডাঃ আলীম চৌধুরী, ডাঃ আবদুল হালিম এবং তার বিদেশিনী স্ত্রী মিসেস হালিম।

জেঠামণি সকলের সাথেই পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, এই অতিথিদের আপ্যায়নের ভার তোমাদের ওপর।

পরিবেশন করলাম। একসময় ভাত দিতে গেলে আলীম বাধা দিয়ে বললো, আর দেবেন না।

আমি হেসে বললাম, আপনি বাঙালি না? এইটুকু ভাত খাচ্ছেন কেন?

এমনিতেই এরা সদ্য বিলেত ফেরত। সবারই পরনে ছিলো কমপ্লিট সুট, সাথে একজন বিদেশিনী। তার ওপর আহারাদিতেও সাহেবি কায়দা দেখে আমাদের কাছে ব্যাপারটি বেশ উপভোগ্য ঠেকছিলো।

সেদিনই আলীমকে আমি কাছে থেকে প্রথম দেখি। এরপর তার সাথে আমার খুব একটা দেখা হয়নি। কোনো কোনো সময় দূর থেকে আসা-যাওয়ার পথে অথবা কোনো অনুষ্ঠানে বসে থাকতে দেখেছি।

বছরখানেক পর একবার আমার খুব মাথাব্যথা আরম্ভ হলো। হোমসের অনেকে হাসপাতালে গিয়ে চোখ দেখাবার পরামর্শ দিলো। সেখানকার হাউস ফিজিসিয়ানও একই পরামর্শ দিলেন। বললেন, চোখের জন্যই মাথাব্যথা। তাই গেলাম একদিন চোখ দেখাতে হোমসের একজন শিক্ষিকাকে সঙ্গে করে। গিয়ে দেখি আলীম সেদিন চোখ দেখছে।

নিয়মমাফিক রোগীদের সাথে বসে রইলাম। একসময় আমার পালা এলো। চোখ দেখার পর একজন নার্স এগিয়ে এসে চোখে একটি ওষুধ দিলেন। বললেন, একটু বসতে হবে। ওষুধ কয়েকবার দেবার পর আবার চোখ দেখতে হবে। নার্স কয়েকবারই ওষুধ দিলেন।

প্রায় ঘন্টাখানেক বসে থাকবার পর আমার ডাক পড়লো। ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে চোখ দেখলেন। বিভিন্ন রকমের কাচ দিয়ে পরীক্ষা করা হলো। পরে ডাক্তার আমাকে নিয়ে গেলেন অন্ধকার একটি ঘরে। সেখানে অন্য একটি যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলেন।

প্রেসক্রিপসন দেয়ার সময় বললেন, আপনার মাথার একটি এক্স-রে করতে হবে। তারিখ দিয়ে বললেন, সেদিন রিপোর্টসহ আসবেন।

এমনিতেই এতোক্ষণ বসে থেকে আমি বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম, তার ওপর আবার চোখের অসুখে মাথার এক্স-রে, একথা শুনেই মনে মনে ডাক্তারকে বিদায় জানালাম। ভাবলাম, আর আপনার কাছে আসবো না। এতো জ্বালাতন সয়ে চোখের চিকিৎসা করাবার ইচ্ছে আমার একেবারেই উবে গেলো। এর খেসারত অবশ্য পরে আমাকে দিতে হয়েছে।

সত্যিই আর যাইনি চোখের ডাক্তারের কাছে। এক্স-রেও করাইনি; কিন্তু ব্যথা ক্রমশই বাড়তে থাকলো। আর এর মধ্যেই স্কুল ছুটি হয়ে গেলো। বাসায় (ময়মনসিংহ শহর) চলে এলাম। এখানে একজন চোখের ডাক্তারকে দেখালাম। তিনি চশমা দিলেন। চশমা নিয়ে ব্যথার কিছুটা উপশম হলো।

ছুটি শেষে ফিরে এলাম হোমসে। কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হলো এম. এ. ফাইনাল পরীক্ষা। ঢাকায় এসে পরীক্ষা দিয়ে গেলাম। কিন্তু পড়াশোনার চাপে আবার শুরু হলো মাথাব্যথা। চশমাতেও আর কাজ হয় না। অগত্যা যেতে হলো আবার কুমুদিনী হাসপাতালেই।

এবার এক্স-রে রিপোর্ট হাতে নিয়েই ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি দেখে বললেন, 'সাইনোসাইটিস'। প্রেসক্রিপসন দিলেন। দিতে হবে পাঁচটি কমবায়োটিক ইনজেকশন। জীবনেও এ রোগের নাম শুনিনি। ডাক্তার আবার বললেন, যদি এখন ইনজেকশন না নেন, তাহলে এটা এমন অবস্থায় আসতে পারে, যখন কপালে বা চোখের চারপাশে সিরিঞ্জ ফুটিয়ে অন্যরকম চিকিৎসা করতে হতে পারে।

বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। তাই পরদিন থেকেই গুরুত্বের সাথে চিকিৎসা করাতে শুরু করি। হোম্‌সের ডাক্তারের কাছে ইনজেকশন নিলাম। মাথাব্যথা সেরে গেলো। ডাক্তার বলেছিলেন, ভালো হলে জানাবেন। কিন্তু মনের ভেতরে দ্বিধা। বিনা কারণে যাওয়ার কষ্ট আবার কে করতে চায়? তাই আর যাইনি। সুতরাং বহুদিন আর ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার ঘটনা ঘটেনি।

কিছুদিন পর হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স এবং হোমসের শিক্ষক-শিক্ষিকারা মিলে একটা বনভোজনের আয়োজন করলেন। কিন্তু আমি অসুস্থতার অজুহাতে ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলাম। এমনিতেই পলায়নী মনোবৃত্তির মানুষ আমি। তার ওপর আবার এত লোকজন! সুতরাং না যাওয়াই ভালো মনে হলো।

কিন্তু তখনকার মতো রেহাই পেলেও পরের বার কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম। এক ছুটির দিনে প্রোগ্রাম হলো মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ দেখতে যাওয়া হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকারাই এই পরিদর্শনের আয়োজন করেছেন। মহানন্দে এবার রওনা হলাম। যথা সময়ে গিয়ে পৌঁছুলাম। ক্যাডেট কলেজ ঘুরে ঘুরে দেখার এক পর্যায়ে দেখি ডাঃ আলীম চৌধুরী ক্যামেরা হাতে অন্য সবার সঙ্গে ঘুরছেন।

ছাদে উঠে সবার সাথে আমিও তাঁর ক্যামেরাবন্দি হলাম। কয়েকদিন পর আমার কাছে একটি খামে কয়েকটি ছবি এসে পৌঁছুলো। ছবিগুলোর মধ্যে চারজনের একটি ছবিতে আমার পাশে ডাঃ আলীমকে দাঁড়ানো দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। ছবিটি লুকিয়ে ফেললাম, যাতে কেউ দেখতে না পায়। অল্প পরিচিত কারো সাথে এর আগে ভুলেও আমার কোনোরকম ছবি কখনো ওঠেনি। তাই ব্যাপারটা নিয়ে মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি বোধের সৃষ্টি হলো। পরে জেনেছিলাম, আলীম ইচ্ছে করেই ছবিগুলো তুলেছিলো অমন করে। মনের মধ্যে ওর গোপন একটা ইচ্ছে ছিলো। ছবিগুলো ওই-ই আমার কাছে পাঠিয়েছিলো।

একবার আমরা স্কুলের কয়েকজন মিলে ঠিক করলাম, ঢাকায় সিনেমা দেখতে যাবো। রওনা হওয়ার সময় দেখি, আলীম গাড়ি নিয়ে গেটে দাঁড়িয়ে আছে। বললো, আমি মেডিকেল এসোসিয়েশনের কাজে ঢাকায় যাচ্ছি। খালি গাড়ি যাবে, ইচ্ছে করলে আপনারাও আমার সঙ্গে যেতে পারেন।

আমরা সবাই হৈচৈ করতে করতে গাড়িতে উঠে বসলাম। বাসের ঝাঁকুনির চেয়ে গাড়িতে যাওয়া অনেক বেশি আরামের। তবে গাড়িতে বসে ওর সাথে আমার তেমন একটা কথা হয়নি। এমনিতেই আমি কম কথা বলি, তার ওপরে এত বড় এক জাঁদরেল ডাক্তার। ওর প্রশ্নের জবাব দিতেই তো আমি ঘেমে নেয়ে উঠি। গল্প করারতো প্রশ্নই ওঠে না।

একবার কী প্রসঙ্গে ও নিজের থেকেই জিজ্ঞেস করলো, আপনি গাড়ির স্পিড কতো ওঠালে খুশি হবেন? আমি ছোট্ট করে জবাব দিলাম, আমার বেশি স্পিডই ভালো লাগে। আরেকবার গাড়িতে কথা উঠলো, পথ অতিক্রম করতে করতে আমরা কে কি দেখছি, এই নিয়ে। আলীম বললো, আমি আমার সামনের আয়নায় শুধু একজনকেই দেখছি। কথাটা শুনে সামনে তাকিয়ে দেখি ওপরের ছোট আয়নায় শুধু আমাকেই দেখা যাচ্ছে। কারণ আমি বসেছিলাম একেবারে ঠিক তার পেছনেই ডানদিকের সিটে। ওর কথা শুনে একটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে গেলাম মুহূর্তেই।

ঢাকায় পৌঁছে আলীম প্রত্যেকের ঠাঁই-ঠিকানামতো গাড়িতে করেই নামিয়ে দিলো। আমাকে সবশেষে নামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আজই ফিরবেন?

বললাম, হ্যাঁ।

বললো, তাহলে যাবার সময় নিয়ে যাবো। তিনটার দিকে আসবো। তৈরি থাকবেন।

বললাম, না, দরকার নেই। আমি নিজেই যেতে পারবো।

কিন্তু সে মানলো না। ঠিক তিনটের দিকে গাড়ি নিয়ে আমার ঠিকানায় এসে হাজির। সেদিন কেনো জানি ওর সাথে ওরই গাড়িতে করে আমার ফিরবার ইচ্ছে হয়নি। তাই বাসার ভেতর থেকে কাজের একটি লোককে দিয়ে ওকে বলে পাঠালাম যে, আমি চলে গেছি।

শুনে আলীম ফিরে গেলো। কিন্তু, সেদিনকার ওই ঘটনায় ও খুবই অপমান বোধ করেছিলো। আমার ওপরে রাগও করেছিলো বেশ।

১৯৬৫ সালের কথা। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হলো। আলীম তখন ওর 'মেডিকেল টিম' নিয়ে বর্ডার এলাকায় আহতদের চিকিৎসা করতে যেতো। তখন রাতে ব্ল্যাক আউট থাকতো বলে আমরা মোমের আলো অল্পক্ষণের জন্য জ্বালিয়ে কাজ ইত্যাদি সারতাম।

বড়দি (ভারতেশ্বরী হোমসের প্রিন্সিপাল মিস মুৎসুদ্দী) এই অবস্থায় বেশ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এতগুলো মেয়ে নিয়ে। আলীমকে বড়দির অনুরোধে রোজ সন্ধ্যায় হোমসে যেতো হতো। তাঁকে ও সাহস দিতো। সন্ধেবেলায় বড়দি নিচতলায় তাঁর অফিসেই থাকতেন। আমার ওপর তখন দায়িত্ব ছিল ফলাফলের রেকর্ড বইয়ে ছাত্রীদের প্রত্যেকের ফলাফল তোলা। বেশ মনোযোগ দিয়েই কাজটা সারতে হতো।

বড়দির টেবিলের পাশের একটি টেবিলে বসে আমি লিখতাম। আলীম এসে বড়দির টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে গল্প করতো। গল্প বলার ব্যাপারে ওর পটুত্ব ছিলো সত্যিই উল্লেখ করার মতো। ওর বলা গল্প সবাই মন দিয়ে শুনতো; কিন্তু আমার নিজের লেখার কাজের দিকে মন দেয়ার কারণে ওর গল্পে আমি কখনই মন দিতে পারিনি। বরং উল্টোটিই ভাবতাম। ভদ্রলোক এত কথা বলেন কেনো? বুড়ো হলে বৌ-ছেলেমেয়েরা ওর ধারেকাছেও ঘেঁষবে না।

বিয়ের পর আলীম বলেছিলো, যেতাম তোমার জন্য, কিন্তু তুমি কোনোদিন বোঝোনি।

এর কিছুদিন পর হোমসে ছুটি হলো। আমার কাজ শেষ করতে দেরি হবে বলে কয়েকদিন থাকতে হলো সেখানে। কিছুদিন আগেই এম. এ-র ফলাফল বেরিয়েছে। সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছি। যেভাবে পড়াশোনা করেছি, আর যে ফলাফল পেয়েছি তাতেই সন্তুষ্ট আমি। এর বেশি আমার আশাও ছিলো না। কিংবা কল্পনাও করিনি।

এর মধ্যেই একটা ঘটনা ঘটলো। বাড়ি যাবো যাবো করছি। একদিন আলীম হোমসে এলো। উদ্দেশ্য আমার সঙ্গেই দেখা করা। আমি খুব অবাক হলাম। ও বললো, আপনার পাস করার খবর পেয়ে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি। আপনাকে একটা বই উপহার দিতে চাই।

আমি ওর এমন সরাসরি কথায় সত্যিই হেসে ফেললাম। বললাম, অভিনন্দন পেয়ে খুশি হলাম। কিন্তু বই কেন? ওটা থাক না।

বোঝা গেলো ও অসন্তুষ্ট হয়েছে। তাই বললো, বই নিতে আপনার এতো আপত্তি কেনো?

তিক্ততা বাড়াতে আর ইচ্ছে হলো না। বললাম, ঠিক আছে, দেবেন।

যাওয়ার দিন ও একটি 'সঞ্চয়িতা' হাতে তুলে দিয়ে বললো, আমি এখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি। হয়তো আপনার সাথে আমার আর দেখা হবে না। আমি ঢাকায় চেম্বার করবো।

মুহূর্তে সৃষ্টি হঁলো একটা থমথমে পরিস্থিতি। পরিস্থিতিটাকে হালকা করার জন্যেই বললাম, ভালোই হলো। ঢাকায় গেলে আপনার বাসায় যাবো।

সেদিনই ময়মনসিংহ চলে এলাম। 'সঞ্চয়িতা' আমার ছিলো না। পেয়ে তাই ভালোই লাগলো। অনেকগুলো কবিতা পড়লাম। বইটির প্রথম পাতায় ও নিজেই আমার নাম আর সন-তারিখ লিখে দিয়েছিলো।

কয়েকদিন পর বইটা খুলেই দেখি, দুটো কবিতার কয়েকটি পঙক্তি কালি দিয়ে গভীরভাবে দাগানো। বুঝলাম, দাগগুলো আলীমেরই দেয়া। লাইনগুলো ছিল :

১. তোমায় কিছু দেব বলে
চায় যে আমার মন
নাইবা তোমার থাকল প্রয়োজন।

২. আমার প্রেম রবি-কিরণ-হেন
জ্যোতির্ময় মুক্তি দিয়ে
তোমারে ঘেরে যেন।

বারবার পড়তে ইচ্ছে হলো লাইন কটি। আর পড়তে পড়তেই মনের সংগোপনে কখন যেনো অনুভব করলাম বেহাগের করুণ সুর। নিজের কাছে নিজেই আমি অবাক হয়ে গেলাম।

ছুটির শেষে হোমসে ফিরলাম। ভাবলাম, ডাঃ আলীম চৌধুরী নিশ্চয়ই ঢাকা চলে গেছেন। কবিতার লাইন কটি মুখস্থ হয়ে গেছে কবেই। এ নিয়ে মনের ভেতরে যে সুরই বাজুক, তার বাস্তব কোনো প্রতিক্রিয়া থেকে আমি মুক্ত। মনতো আর কেউ দেখবে না, আর সে মানুষটির সামনেও পড়তে হবে না। মানুষটিকে এখন আমার বড় ভয়।

কিন্তু যাওয়ার পরদিনই টের পেলাম, আলীম তখনও যায়নি।

কুমুদিনী হাসপাতালের মেট্রন ছিলেন বাসন্তী দেবী। আলীম বাসন্তীদিকে বলেছিলো, এখান থেকে চলে যাচ্ছি মনে একটা দুঃখ নিয়ে। একটি মেয়েকে ভালো লেগেছিলো। কিন্তু ভালোলাগার সেই কথাটি তাকে বলার সুযোগ পেলাম না ।

আলীমের ব্যাপারে ছিলো বাসন্তীদির অগাধ শ্রদ্ধা। শুধু তিনিই নন, মির্জাপুরের সকলেই তাকে অত্যন্ত ভালবাসতো। সবার মুখে মুখে ফিরতো তাঁর প্রশংসা। দূর থেকে আমারও ছিলো তাঁর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা।

বাসন্তীদি তাঁর স্যারের এ মনোকষ্টের কথা জেনে খুবই দুঃখ পেলেন। ঠিক করলেন আমাকে একথা বলবেন।

একদিন সন্ধ্যায় তিনি এলেন। বললেন, চলুন বেড়িয়ে আসি। হাসপাতাল এবং কোয়ার্টারের মাঝখানে ছিলো বড় একটা পুকুর। পুকুরঘাটে বসে বাসন্তীদি তাঁর স্যারের সব কথা আমাকে খুলে বললেন। আমি নির্বাক হয়ে শুধু শুনলাম। একটা কথাও বলতে পারলাম না। তিনিও বুঝলেন, আমার মনের অবস্থা। শেষে সময় দিলেন আমার নিজের মনের সাথে একটা বোঝাপড়া করবার।

মনের ভেতরে দারুণ এক যন্ত্রণা নিয়ে হোমসে ফিরলাম। কয়েক রাত ঘুমুতে পারলাম না। এই অবস্থায় একদিন আলীমের চিঠি হাতে করে বাসন্তীদি এসে হাজির। আমার পরিবর্তে আলীমের চিঠির প্রত্যুত্তর বাসন্তীদিই নিয়ে গেলেন। দুজনেই দুজনার মনের কথা জানলাম কিন্তু সমস্যাতো অনেক।

আমার বাবা অসুস্থ। ১৯৬৫-এর যুদ্ধের পর দুবোন কোলকাতা চলে গেছে। ছোট তিনটে ভাইবোন। মা আর আমি। চাকরি করে সংসার চালাই। তার ওপর ধর্মের ব্যবধান। এই বিয়ের পর আমাদের সংসারে যে বিপর্যয় নেমে আসবে, সেকথা ভাবতেও ভয় করছে। আমার এইসব সমস্যাগত ভাবনার কথা আলীমকে খুলে জানালাম। বললাম, এত বড় সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য প্রচুর সাহস দরকার। আমার তা নেই। কিন্তু আমার এসব কথা শোনার পরও আমার সব দায়-দায়িত্ব ও নিজের কাঁধে তুলে নেয়ার অঙ্গীকার করলো। বাসন্তীদি আমাকে সাহায্য করলেন। বললেন, আপনি স্যারকে চেনেন না বলেই এতো দ্বিধা করছেন। আমার কথা বিশ্বাস করুন, আপনি ঠকবেন না। বরং স্যারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেই জীবনে বড় একটা ভুল করবেন। আমার এ সময়কার মানসিক দোটানার কথা বলে শেষ করবার ছিলো না। তাই পুরো তিন-তিনটা মাস সময় লেগেছিলো সিদ্ধান্ত নিতে।

তখন আলীম চলে এসেছে ঢাকায়। বাসা নিয়েছে ৬২/২, পুরানা পল্টনে। চেম্বার ও বাসা একই সাথে। ঢাকায় এসে আর মির্জাপুরে যায়নি ও। আমাদের দুজনের মধ্যে তখন সেতুবন্ধ কেবল বাসন্তীদি।

আলীম অবশেষে ওর আত্মীয়স্বজনকে এ বিয়ের কথা জানায়। একরোখা ছেলেকে পরিবারের সবাই ভালোভাবেই চিনতো। কেউ বাধা দেয়ার কথা ভাবতেও পারেননি। আলীমের মা বললেন, আমার ছেলে কখনও ভুল করেনি। এবারও ভুল করবে না।

'৬৫ সালের ২০ ডিসেম্বর। আলীমের বন্ধু ডাক্তার আশরাফ হোসেন এবং মিসেস আইয়ুব বলে পরিচিত একজন ভদ্রমহিলা গাড়ি করে গিয়ে আমাকে নিয়ে এলেন। আলীমের ফুফাত ভাইয়ের ছেলে ডঃ লতিফ চৌধুরীর বাসায় গিয়ে উঠলাম। তার জার্মান স্ত্রী ইয়ুটা এবং সে দু'জনেই অসম্ভব সমাদরে গ্রহণ করলো আমাকে। সেখানেই মৌলবী এনে ধর্ম পরিবর্তন করা হলো। আর বিয়ে পড়ানো হলো ২১ ডিসেম্বর মগবাজারে আপার বাসায়।

আমার শ্বশুর অত্যন্ত কড়া মেজাজের ছিলেন বলে আমার পরিচয় বিয়ের সময় গোপন রাখা হয়েছিলো। সবাই ভয় পেয়েছিলেন এই ভেবে যে, আগে জানতে পারলে তিনি যদি এ বিয়েতে বাধা দেন, তাই।

বিয়ের কয়েকদিন পর তাঁকে বলা হলো আসল কথা। শুনে তিনি ছুটে এলেন আমার কাছে। বললেন, বউ, তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার সন্ন্যাসী ছেলেকে তুমি সংসারী করেছো। আমার ছেলে খুবই পুণ্যের কাজ করেছে।

এমনটা ভাববার অবশ্য কারণ ছিলো। আলীম যখন বিয়ে করে, তখন ওর বয়স ছত্রিশের মতো। আমার ছিলো তেইশ। আমার চাইতে ও বড় ছিলো তের বছরের। আলীমের বড় বোন, আমার আপা তাঁর ছোট ভাইয়ের বিয়ের জন্য অনেক চেষ্টা-চরিত্র করেছিলেন, কিন্তু পারেননি। তাই সবাই ভেবে নিয়েছিলো, ও হয়তো আর বিয়েই করবে না।

আমার শাশুড়ি আমাকে একদিন বললেন, এতোদিন আমার একটা মাত্র মেয়ে ছিলো। আজ থেকে আমার মেয়ের সংখ্যা হলো দুটি।

শ্বশুর, শাশুড়ি, ভাসুর, দেবর, আপা, দুলাভাই সকলের আদরে–ভালোবাসায় আমার নতুন জীবন শুরু হলো। আলীমের ভালোবাসার কথা অক্ষরবন্দি করবার ক্ষমতা আমার নেই। গভীর যে ভালোবাসা, তাকে প্রকাশ করা যায় না। সে পরম স্মৃতি একান্ত আমার হয়েই থাক।

মাঝে-মধ্যে নিজের ভাগ্য দেখে নিজেরই বিশ্বাস হতো না। এবাড়ির সবাই ছিলো সোনার মানুষ। মানুষ কতো উদার হতে পারে, এদের কাছে আমি তা শিখলাম। মনে মনে শুধু কৃতজ্ঞতা জানাতাম বাসন্তীদির প্রতি। আমার মনকে তৈরি করবার জন্য তাঁর অবদানই ছিলো সবচেয়ে বেশি। তিনি না থাকলে কেবল চিঠির ভেতর দিয়ে আলীমকে আমার সম্পূর্ণ জানা হতো না। চিঠি নিয়ে আসতেন বাসন্তীদি ঠিকই, কিন্তু ওর সম্পর্কে বলতেন তার চাইতেও অনেক বেশি। ছবছরের বিবাহিত জীবনে বুঝেছি, ওর সম্পর্কে বাসন্তীদি কখনোই একটি কথাও ভুল বলেননি, কিংবা বলেননি বাড়িয়ে।

আলীম আমার কাছে দেয়া ওর অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলো। ছোটভাই হাফিজকে পাঠিয়ে দিয়েছিলো বাবা-মার কাছে খবর দেয়ার জন্য। মাসখানেক পর আলীম নিজেই গিয়ে বাবাকে নিয়ে এলো ঢাকায়। বাবার অর্ধেক শরীর তখন অবশ। বাবার সাথে ছোট বোন দীপাও এলো। এর কয়েকদিন পর এলো মা আর দুভাই–শঙ্কর, স্বপন। ওদের সবাইকে স্কুল আর কলেজে ভর্তি করিয়ে দেয়া হলো। এরপর থেকে একটি দিনের জন্যও ওদের কাউকেই আলীম কোথাও যেতে দেয়নি। ওর ব্যবহারে এরা সবাই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। বাবা-মা এক সময়ে আমার চেয়ে যেন ওকেই বেশি করে ভালোবেসে ফেললেন। আমার মা কখনও আলীমকে নাম ধরে ডাকেননি। তিনি বলতেন, বাবা। টেলিফোনে কেউ পরিচয় জিজ্ঞেস করলে বলতেন, আমি ডাক্তার সাহেবের বড় মেয়ে।

আমার নিজের মা-বাবা, ভাইবোনদের প্রতি আলীমের প্রায় বাড়াবাড়ি পর্যায়ের দায়িত্বকর্মের ব্যাপারটা দেখে আমি মাঝে মাঝে খুবই বিব্রতবোধ করতাম। মনে হতো,

আমাদের জন্য ও এতোটা করছে, এর ফলে না জানি ওর পক্ষের আত্মীয়স্বজনের ধারণাটা কী রকম হচ্ছে! একদিন ওকে বলেই ফেললাম আমার মনের এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের কথা।

ও বললো, আমি বাবাকে আনার আগে মাঈকে (আমার শাশুড়ি) জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, বাবা, বহু কষ্ট করে তারা তাদের মেয়েকে এম. এ. পাস করিয়েছেন। তাদের দেখাশোনা করা তোমার কর্তব্য। তাদেরকে অবশ্যই তোমার কাছে আনা উচিত।

আলীম বাসন্তীদির প্রতিও ওর কর্তব্য পালন করেছিলো। তাঁকে ও আর কুমুদিনী হাসপাতালে যেতে দেয়নি। চেষ্টা করে ঢাকার কলেরা রিসার্চ হাসপাতালে চাকরি নিয়ে দিয়েছিলো।

১৯৬৭ সালের ২৬ জুন ঢাকা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট হাসপাতালে আলীম এসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে যোগ দেয়। পরে ওই বছরেরই ডিসেম্বরে ঢাকা মেডিকেল কলেজে বদলি হয়ে যায়। এখানে ১৯৭০-এর সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ছিলো। পরে ওকে বদলি করা হয়েছিলো রাজশাহীতে।

আমাদের বড় মেয়ে নীপার জন্ম হয় ১৯৬৮ সালের ১২ নভেম্বর। নীপা হওয়ার আগে আমার একটা অপারেশন হয়েছিলো। কাজেই ভয় ছিলো সন্তান না হওয়ার। তাই নীপা হলে আমরা সবাই আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আলীমের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ আমাদের সব আনন্দকে ম্লান করে দিয়েছিলো। ও ছিলো এমনিতেই চাপা স্বভাবের মানুষ। ওর এ আচরণে আমরা সত্যিই বিস্মিত না হয়ে পারিনি।

রাত বারোটায় নীপা হওয়ার পর বাসায় গিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত ফোন করে সন্তানের জনক হওয়ার খবর আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধব সবাইকে জানায়। আর সকালবেলা প্রচুর মিষ্টি আর ফটোগ্রাফার নিয়ে সোজা হাসপাতালের কেবিনে এসে হাজির। তোলা হয় ১০ ঘন্টা বয়সের নীপার ছবি। যারাই আসছিলো, তাদের সকলকেই করানো হচ্ছিলো মিষ্টিমুখ।

নীপার নামটিও ওরই রাখা। আমি আর দীপা নামের একটি দীর্ঘ তালিকা তৈরি করেছিলাম; কিন্তু একটিও ওর পছন্দ হয়নি।

নীপার জন্মের এক বছর পর ২৬ নভেম্বর ছোট মেয়ে শম্পার জন্ম হয়। তখনো আলীম আনন্দে একই রকম আত্মহারা। আগের মতোই সকালবেলা ক্যামেরাম্যান আর মিষ্টি নিয়ে উপস্থিত। এবার আর মেয়ের নাম রাখবার সুযোগ পেলো না ও। আমার শাশুড়ি আগেই নীপার সাথে মিলিয়ে নাম রেখে ফেললেন শম্পা। নামটি ওর পছন্দ হলো।

মেয়েদের আলীম ভালবাসতো বড় বেশি। সন্তান দুটিকে ঘিরে ওর পরিকল্পনার অন্ত ছিলো না। বলতো, নীপা-শম্পাকে আমি নিজের হাতে লেখা শেখাবো। ওর হাতের

লেখা খুব সুন্দর ছিলো। আরও বলতো, ওরা যখন পড়তে শুরু করবে, তখন সন্ধ্যায় এক ঘন্টা করে রোগী দেখা কমিয়ে দেবো। ওদেরকে আমি আমার নিজের আদর্শে গড়ে তুলবো।

ওরা দুজনই নভেম্বরে হয়েছে। পরের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ওদের বয়স তিন মাসের কাছাকাছি। কিন্তু এই দুধের শিশুদের নিয়েই আমাকে ওর সঙ্গে শহীদ মিনারে যেতে হতো। আলীম বলতো, ছোটবেলা থেকেই ওদের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। ওদের দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

৬২/২, পুরানা পল্টনে চেম্বার রেখে বাসা নেয়া হয়েছিলো ৬১/ডি, আজিমপুর কলোনিতে। পরে আবার বাসা, চেম্বার আর ক্লিনিক একসাথে করার জন্য আলীম বড় একটা বাড়ি ভাড়া করতে চাইলো। অনেক বাড়ি দেখলাম ঘুরে ঘুরে। কিন্তু পছন্দমতো পাওয়া যাচ্ছিলো না।

১৯৭০ সালের নভেম্বরে একদিন আলীম স্কুল থেকে আমাকে নিয়ে যাবার সময় বললো, একটা বাসা পাওয়া গেছে। চলো, যাবার পথে দেখে যাই।

২৯/১,পুরানা পল্টনের বাসায় আমাকে নিয়ে গেলো ও। তিনতলা বাড়ি। ঘুরে ঘুরে সব দেখলাম। ঠিক যেমনটি আলীম চায়, তেমনি একটা বাড়ি। নিচতলায় চেম্বার এবং ক্লিনিক সুন্দরভাবে সাজানো যাবে। দোতলায় ভাইবোনদের নিয়ে আমরা থাকবো। তিনতলায় মা–বাবা। আলীম মহাখুশি। কিন্তু আমি খুশি হতে পারলাম না। কীজানি কেন! আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ও বিব্রতবোধ করলো। বললো, কি হলো? তোমার কী বাসা পছন্দ হয়নি?

বললাম, বাসাটাতো এমনিতে ভালোই কিন্তু আমার মনটা খারাপ হয়ে গেছে এখানে এসে। ইচ্ছে করছে না এখানে আসতে। আমার কথা শুনে ওর সব উৎসাহ দমে গেলো।

অবশেষে সবার অনুরোধে ওই বাড়িতেই এসে উঠতে হলো। ১৯৭০-এর নভেম্বরে চলে এলাম ২৯/১, পুরানা পল্টনের বাসায়।

১৯৭০-এর ১৫ মার্চ আমার শ্বশুর মারা গেলেন। তখন রাজপথে মিছিল আর মিছিল। আন্দোলনে মুখর ঢাকা। আলীম এ সময়টায় কিছুতেই ঢাকা ছাড়তে চায়নি। ও তাই রাজশাহীর বদলি ঠেকাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু ঠেকাতে পারেনি। ১৯৭১-এর অক্টোবরে ওকে রাজশাহী চলে যেতে হলো।

১৯৬৫ সালের ২১ ডিসেম্বর ওর কাছে এসেছিলাম। ১৯৭১-এর ১৫ ডিসেম্বর ও চলে গেলো বড় কষ্টে, একান্ত অনিচ্ছায়। নীপা, শম্পা আর আমি ওর সারাটি অন্তর জুড়ে ছিলাম। হয়তো তার চাইতেও বেশি অধিকার করে ছিলো দেশ, দেশের মানুষ। তাই বুঝি মুক্তিযুদ্ধের সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এমনিভাবে কাজ করতে ওর এতোটুকু ভয় করেনি।

নীপা-শম্পা ওদের বাবার কথা মনে করতে পারে না। বিশ বছর আগে নীপা তিন আর শম্পা দুবছরের। বাবার চেহারা ওদের মনে থাকবার কথা নয়। কোনো টুকরো স্মৃতিও না। ওদের বাবাকে ওরা চিনেছে অন্যের মুখ থেকে শুনে। তাই হাজারো প্রশ্ন ওদের মনে। বিশ বছর ধরেই ওদের অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দিয়ে যেতে হচ্ছে আমাকে। না–দেখা, না-জানা সেই মানুষটিকে ঘিরে ওদের কৌতূহলের অন্ত নেই।

নীপা-শম্পার মনে ওদের বাবার জন্য যে শূন্যতা, সেই শূন্যতা দূর করবার সাধ্য আমার নেই। আর তা পারবো না বলেই যেমনটি ওকে দেখেছিলাম, ঠিক তেমন করেই ওদের কাছে ওকে তুলে ধরার জন্যই এই অক্ষরমালার অক্ষম আঁকিবুঁকি।

জানি, আমার এই প্রয়াসের সাহিত্যিক মূল্য নেই কিছুমাত্র। তবু হারিয়ে যাওয়া একজন মানুষকে তাঁর আপন ভুবনের আত্মপরিজন এবং তাঁকে যাঁরা কোনোদিনও তেমন করে জানবার সুযোগ পাননি, তাদের কাছে তাঁর ওই পরিচয়কে তুলে ধরবার স্বার্থেই আমার এই ক্ষুদ্র আর অক্ষম প্রয়াস।

পরিশিষ্ট

যে স্মৃতি রক্ত ঝরায়

আহমদ রফিক

ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র আলীম চৌধুরী, বন্ধু আলীম চৌধুরী, শহীদ আলীম চৌধুরী। আলীমকে ঘিরে নানা ঘটনার স্মৃতি ভুলে যাওয়া কঠিন। একাত্তরের নৃশংস পটভূমিতে রক্ত ঝরারও উৎস এই স্মৃতি। ভাবতে কষ্ট হয়, আলীম নেই। না থাকাটাই রক্ত ঝরার একমাত্র কারণ নয়, জীবন থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে আমাদের আরো অনেক বন্ধুই। কিন্তু খুনি আলবদরদের বর্বরতার শিকার আলীম, এটাই ভাবতে গেলে বড় কষ্ট হয়। মনে পড়ে যায় শহীদ ফজলে রাব্বি এবং আরো অনেকের কথা, হিসাব–নিকাশ করে, নামের তালিকা তৈরি করে, পরিকল্পনামাফিক ঠাণ্ডা মাথায় যাদের খুন করা হয়েছে।

আলীম চৌধুরীর কথা উঠলে কলেজ জীবনে তার সাথে সম্পর্কের কথাই মনে পড়ে যায় ; নানা পটভূমিতে, নানা ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাক্ষী সেই সময়। আর বাঁশের ছাউনির সেই ছাত্রাবাস, যা 'মেডিকেল ব্যারাক' নামে একদা ছাত্রমহলে পরিচিত হয়ে উঠেছিলো। এখনকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের 'আউটডোর'-এর অংশ, ডিসপেন্সারি ও সেবিকা ভবন—এই পুরো জায়গাটির উপর গড়ে উঠেছিলো। তখনকার 'মেডিকেল ব্যারাক'-এর চারপাশে পাকা দেয়ালের বদলে কাঁটাতারের বেড়া, এখানে-সেখানে গাছগাছালির সবুজছায়া; হোস্টেলে ঢোকার জন্য ফুলার রোড থেকে একটি গেট আর দক্ষিণ-পশ্চিমে বকশী বাজারের দিকে আরেকটি—এই দুই গেট যুক্ত করেছে আঁকাবাঁকা খোয়া বিছানো একটি রাস্তা। এই রাস্তারই দুই পাশে সারি সারি শেড, অধিকাংশই বাঁশের ছাউনির, মাত্র তিনটি টিনের ছাউনির, চেহারায় একেবারে সেনাছাউনির মতোই, তাই বোধহয় হোস্টেল শব্দের বদলে ছাত্রাবাসটি 'ব্যারাক' নামেই রাজনৈতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলো। এই সব শেডের আড়াল থেকে রাস্তায় সঙঘটিত

ক্রিয়াকলাপ অতি সহজে দেখা যেতো। অনেক সুবিধার মধ্যে এই ছাত্রাবাসের এটিও ছিলো অন্যতম সুবিধা।

ফুলার রোডের গা-ঘেঁষে সমান্তরালভাবে দাঁড়ানো দুটো শেডের প্রথমটি বাঁশের ছাউনির; গেটের কিছুটা পশ্চিমে এই ১২ নম্বর শেডের গেট সংলগ্ন শেষ রুমটির বাসিন্দা ছিলেন আলীম চৌধুরী। এর পশ্চিমদিকের দীর্ঘকায় এবং টিনের ছাউনির ২০ নম্বর শেডটি ছিলো ফুলার রোডের সমান্তরাল দ্বিতীয় ব্যারাক। এরই ছয় নম্বর কক্ষের বাসিন্দা ছিলাম আমি। তাই ১২ নম্বরের সামনে দিয়েই যাওয়া-আসা। ভোরের লেকচার ক্লাস থেকে ফেরার পথে প্রায়ই দেখা যেতো ১২ নম্বরের শেষ মাথায় বারান্দায় উবু হয়ে বসে আলীম দাঁত ঘষছে। অবাক লেগেছে এই জন্য যে, মেডিকেল কলেজের ছাত্র ক্লাসে না গিয়ে এত বেলায় সবে ঘুম থেকে উঠেছে, এটা নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা।

বেশ কিছুকাল পর—তখন আমরা পরস্পরের বন্ধু, একদিন হেসেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী ব্যাপার! ক্লাস ফেলে এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোন কেমন করে? জবাবে লজ্জিত হেসে বলেছিলো, "অনেক রাতে ঘুমোই কি না, তাছাড়া মেডিসিন-সার্জারির মোটা মোটা বই থাকতে লেকচার শুনে কি হবে?"

এই ছিলো আলীম চৌধুরী। এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। পেশায় নিবিষ্ট নিমগ্ন না-হওয়া অবধি এমনই ছিলো তার আচরণ আর চলাফেরা। তা না হলে মেডিকেল ব্যারাকের স্বনামখ্যাত 'মেস' ছেড়ে আলী মিয়ার 'মেকো' হোটেল-রেস্তরাঁয় মাস-কাবারি খেতে যাবে কেন আলীম? প্রায়ই দেখতাম, অবেলায় 'মেকো'–তে খেতে বসেছে অথবা প্রায়ই কবির আর আলীম। ঠাণ্ডা ভাত, মাছের টুকরো শেষ, খানিকটা ঝোল আর হাতল ভাঙা চায়ের কাপে ততোধিক ঠাণ্ডা ডাল। মাঝে-মধ্যে সঙ্গে বসেছি 'মেকো'র বিস্বাদ চা-ভর্তি কাপ হাতে নিয়ে। এই খাওয়ার মুখে কোনো বিস্বাদের অভিব্যক্তি দেখিনি।

অনিয়মী, বিচিত্র স্বভাবের ছাত্রদের খাওয়া-দাওয়ার জন্যই ফুলার রোডের ওপারে পরপর তিন তিনটে হোটেল-কাম-রেস্তরাঁ বেশ জাঁকিয়ে বসেছিলো জমজমাট ব্যবসা নিয়ে। নাম 'পপুলার', 'মেকো', 'নাজমা'। পরে 'জালালাবাদ' নামে আরো একটি এসে বসেছিলো ; কিন্তু বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় উঠে যায়। হোস্টেল–মেসে বেলা তিনটে–চারটে পর্যন্ত ভাত নিয়ে কে বসে থাকবে? তাই অনিয়মীদের জন্য এগুলোই ছিলো ভরসা। তাছাড়া নানা কারণে পকেটের 'রেস্ত' কমে গেলে 'মেকো', 'পপুলার'-এর বাকির খাতার উপর ভর করেই চলতে হতো। আমার নাম ছিলো 'পপুলার'–এর খাতায়। তাই দেখাশোনাটা প্রায়ই হতো অবেলার রেস্তরাঁয়। হোস্টেল–মেসের প্রবাদপ্রতিম মাস–শেষের 'গ্রান্ড ফিস্ট' বড় একটা চিত্তচাঞ্চল্য ঘটায়নি আমাদের। বরং তার চেয়ে বড় আকর্ষণ ছিলো রাজনীতি ও সাহিত্য–সংস্কৃতিচর্চায় যা ঠাস বুনোনির মেডিকেল শিক্ষার চাপ সত্ত্বেও এমনি ধারার অনেককেই অনিয়মী ও স্বতন্ত্র করে তুলেছিলো; সেই সঙ্গে আরো ছিলো বাড়তি পাওনার মতো আড্ডার টান। আলীম ছিলো তাদেরই একজন।

অবশ্য আলীমের সাথে ঘনিষ্ঠতা একটি অপ্রিয় ঘটনার মধ্য দিয়ে; কিন্তু সে ঘটনা আমাদের মধ্যে কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলেনি। একান্ন সালে কলেজ ইউনিয়নের দ্বিতীয় নির্বাচন নিয়ে খুব তোড়জোড় চলছে। প্রথম নির্বাচিত সংসদে ছিলো বামপন্থীদের একক প্রাধান্য। দ্বিতীয় নির্বাচনে আমাদের গ্রুপের নেতৃস্থানীয় দু একজনের অবিচক্ষণ পদক্ষেপের কারণে হাওয়া কিছুটা ভিন্ন মোড় নিয়েছিলো। তাই আমাদের সিদ্ধান্ত ছিলো সাধারণ সম্পাদক পদে জনপ্রিয় একজন বামপন্থীকে মনোনীত করা। কিন্তু আলীম চেয়েছিলো সেই পদে মনোনয়ন। তার পক্ষেও সমর্থক একেবারে কম ছিলো না।

তখনকার বাম রাজনীতি আজকের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতিরই ছিলো। ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানে নীতিগত সিদ্ধান্তের হেরফের হওয়া শৃঙ্খলাভঙ্গের মতোই মনে করা হতো। তবু চাপের মুখে এবং আরো নানা কারণে আমাদের দল থেকেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও নির্বাচনী ঐকমত্য রক্ষার খাতিরে পূর্ব সিদ্ধান্ত ভেঙে আলীমকে সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনীত করা হলো। কিন্তু দুর্যোগের মধ্যেও এই পদটি আমরা হারাতে চাইনি বলেই প্রতিপক্ষের পাঁচমিশালি মোর্চায় রাজনৈতিকভাবে আমাদেরই সমর্থক জনৈক জনপ্রিয় ছাত্রকে সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিযোগিতার জন্য দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়, যা অনেকেই নীতিগতভাবে সমর্থনযোগ্য বলে মনে নাও করতে পারেন। সেই নির্বাচনে আলীম হেরে যায়, আমরা দলগতভাবে অনেক কটা পদ হারাই। আলীম বিষয়টি আঁচ করতে পেরেছিলো। পরে এই নিয়ে তার সাথে খোলামেলা আলোচনার মধ্য দিয়েই আমাদের মধ্যে হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। এমনি স্বচ্ছ ছিলো তার মন। হেরে যাওয়ার ক্ষোভ মনে পুষে রাখেনি। বরং ঘটনাটিকে সে রাজনৈতিকভাবেই নিয়েছিলো।

এরপর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পরস্পরকে চেনাজানা আরো গভীর হয়ে ওঠে। অনেক সক্রিয় কর্মীর মতো আলীমও এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একুশে ফেব্রুয়ারি দুপুরে তার ১২ নম্বর শেডের বারান্দায় উত্তেজিত ছাত্রদের জটলা; গেটের খুব কাছে বিপজ্জনক অই বারান্দায়ই আবুল বরকত গুলিবিদ্ধ হন। বেশ কিছুসংখ্যক বুলেট আলীমের ১২ নম্বর শেড বিদ্ধ করে, বিদ্ধ করে ১৩ এবং ২০ নম্বর শেডেরও কয়েকটি কক্ষ। স্বাভাবিক কারণেই আলীম তখন ঘরে ছিলো না, থাকার কথাও নয়।

বাহান্ন সালের ৩১ জানুয়ারি বার লাইব্রেরি হলে মৌলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে রাষ্ট্রভাষার দাবি নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠকের আয়োজন। শেষ দুপুরে যাওয়ার পথে ভেবেছি: দেখি যদি আলীমকে ঘরে পাওয়া যায়, একসাথেই যাওয়া যাবে। ওর ঘরের সামনে দিয়েই আমার যাওয়া-আসার পথ। দেখি, আলীম তৈরি হয়ে বেরুচ্ছে। তেমনি একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় আরো অনেকের মতোই আলীম হাজির। একমাত্র অসুবিধা ছিলো তার ভোরে ওঠার আলস্য। তাই আবছা ভোরে হরতালের রাস্তা অবরোধে কিংবা তেমনি ভোরের প্রভাতফেরিতে আলীম তার গরহাজিরা পুষিয়ে নিতো রাতজাগা কাজের মাধ্যমে।

একুশে ফেব্রুয়ারি মেডিকেল ছাত্ররাই প্রথম গড়ে তোলে কন্ট্রোল রুম বিশের এক নম্বর কক্ষে, এসেম্বলি ভবনের সবচেয়ে নিকট অবস্থানের কারণে। অন্যান্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে সেই কন্ট্রোল রুমে আলীম ও আমি পাশাপাশি বসে 'স্ক্রিপ্ট' লিখেছি সরফুল আলম, আবুল হাশিমদের কণ্ঠে প্রচারের উত্তেজক খবর পরিবেশনের জন্য। আবার এরই মধ্যে গেটের কাছে জমায়েত উত্তেজিত ছাত্রজটলার উদ্দেশে মাইকে গরম বক্তৃতাও চালিয়েছে আলীম। উদ্দেশ্য, ছাত্ররা যাতে সুশৃঙ্খল সংবদ্ধতা নিয়ে এসেম্বলি ভবন ঘেরাওয়ের জন্য এগিয়ে যায়।

তেইশে ফেব্রুয়ারি তার কক্ষের কয়েক গজ দূরে শহীদ মিনারের জন্য স্থান নির্বাচনে যেমন তার ভূমিকা কোন অংশে গৌণ ছিলো না, তেমনি ছিলো না রাতভর শহীদ মিনার গড়ার কাজে অংশ নিতে কোনো আলস্য। একমুখ ঘাম নিয়ে অন্যদের মতোই সারারাত মিনারের কাজে লেগে থেকেছে আলীম।

যেমন প্রগতিশীল রাজনীতিতে, তেমনি প্রগতি সাহিত্যের চর্চায়ও আলীমের উৎসাহ ছিলো আন্তরিক। এই উভয়দিকেই তার ঝোঁক ক্রমেই বাম চেতনার দিকে প্রসারিত হতে থাকে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ ইউনিয়নের প্রকাশিত দ্বিতীয় ম্যাগাজিনটিতে সাহিত্য সম্পর্কে তার লেখাটিতেও এই আভাস মেলে।

সেকালে ঢাকায় সাহিত্য পত্রিকার সংখ্যা ছিলো অত্যন্ত কম। এর মধ্যে মেডিকেল ছাত্রদের হাত দিয়েই দুই দুইটি সাহিত্য মাসিক প্রকাশিত হয়। আমাদের সহপাঠী মঈদুর রহমানের 'খাপছাড়া' আর কবির-আলীমের 'যাত্রিক'। কিন্তু 'খাপছাড়া'র তুলনায় 'যাত্রিক' ছিলো পুরোপুরি প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রসারে নিবেদিত। 'যাত্রিক'-এর প্রতিটি সংখ্যার লেখা বিচারে এ কথার প্রমাণ মিলবে। সেই সঙ্গে আরো প্রমাণ মিলবে রাজনীতি ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তার চেতনার গুণগত উত্তরণের। তাই একসময়ের ছাত্রলীগ-ঘেঁষা আলীম তার 'যাত্রিক'-এ স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতে পেরেছে যোসেফ স্তালিনের মৃত্যু উপলক্ষে কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনা। সম্পাদকীয় লিখেছে 'স্টালিনের মৃত্যু নেই' শিরোনামে। ছেপেছে স্তালিনের পূর্ণ পৃষ্ঠা ছবি। মুসলিম লীগের স্বৈরতন্ত্রী শাসনে এই প্রত্যেকটি কাজ ছিলো রীতিমতো ঝুঁকির, এমনকি বিপজ্জনকও বটে। যাই হোক, বিপদ সেবার তাকে স্পর্শ করেনি।

এই সাহিত্যপত্র 'যাত্রিক' প্রকাশের তাড়নায় অস্থির হয়ে উঠেছিলো আলীম, সঙ্গে ছিলো আহমেদ কবীর। পত্রিকা বেরোবে, কবে বেরোবে, কিভাবে বেরোবে এই সব নিয়ে দিনের পর দিন কতইনা হিসাব-নিকাশ, কত আয়-ব্যয়ের তালিকা তৈরি, আর সেই সঙ্গে কত যে চায়ের কাপ নিঃশেষ হওয়া, তা বোঝা গেছে আলী মিয়ার বাকির অঙ্কে। এই বৈঠকে প্রায়ই যোগ দিয়েছে জহীর (মিরপুরে ঘাতকদের হাতে নিহত শহীদ জহীর রায়হান)। সে তখন সবে লেখায় হাত দিয়েছে। ছটফটে অস্থির প্রকৃতির জহীরের তখন সাংবাদিক-সাহিত্যিক হওয়ার স্বপ্ন। এই জহীর 'যাত্রিক'-এর প্রকাশনায়

যথেষ্ট সাহায্য করেছে, শুধু লেখা দিয়ে নয়, মূলত কাজকর্মের মাধ্যমেই। পরবর্তীকালে জহীর 'প্রবাহ' নামে একটি সাময়িকী প্রকাশ করেছিলো। সম্পাদক ছিলেন কবি আহসান হাবীব।

যাত্রিক প্রকাশের পরিকল্পনা, লেখা সংগ্রহ, ছাপার সমস্যা, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য এই সব নিয়ে সারাক্ষণ আলীমের মগ্নতা দেখে মনে হয়েছে, সাহিত্য মাসিক 'যাত্রিক' বুঝি তার মানসসন্তান। অবশ্য সম্পাদনায় আলীম ও কবীর দুজনেরই নাম ছাপা হতো, আর প্রকাশনায় সরফুল আলম। সব মিলে যেন একটা যৌথ সংসারের কাজ। উদ্দেশ্য, কাগজটির মান ধরে রাখা, সেই সঙ্গে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখতে চেষ্টা করা। নর্থব্রুক হল রোডের রেনেসাঁস প্রিন্টার্স থেকে ছাপা এই কাগজটির জন্য ছাপাখানার মালিক জাকিউল্লাহও (ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ছেলে) কম পরিশ্রম করেননি, অবশ্য আমাদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কারণে।

মনে পড়ে সদ্য ছাপা 'যাত্রিক'-এর প্রথম সংখ্যার (পৌষ, ১৩৫৯) কয়েকটা কপি হাতে নিয়ে খুশিতে উচ্চকিত আলীম যখন ব্যারাকে এসে পৌছালো, তখন সেই কাগজের কাঁচা গন্ধ নাকে টেনে আমাদেরও খুশির শেষ ছিলো না। ছাত্রজীবনে, বিশেষ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতো জটিল ও শ্রমসাধ্য বিষয়ের ছাত্র হয়ে সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ তখনকার জন্য যেমন বিরল ঘটনা, তেমনি গর্বেরও বিষয়। অর্থনৈতিক ঝুঁকি যেমন ছিলো, তেমনি ছিলো পড়াশোনায় ক্ষতির ভয়। সব ঝুঁকি, সব ভয় হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে মনে হয় সাহিত্যচর্চার জাদুকরী টানে আলীম এই দায়িত্ব নির্দ্বিধায় কাঁধে তুলে নিয়েছিলো। আর সাহিত্য অঙ্গনে 'যাত্রিক' সেসময় মোটামুটি ভালোই নাম কিনেছিলো।

'যাত্রিক' প্রকাশনার মধ্য দিয়ে একটি বিষয় বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো; আর তা হলো সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আলীমের বিশ্বস্ততা। দেখা গেল, এদিক থেকে অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছে আলীম। পরবর্তী সময়ে এই বিশ্বাস আরো সুনির্দিষ্ট, আরো দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে। 'যাত্রিক'-এর সংখ্যাগুলো মিলিয়ে দেখলে এ সত্য বোঝা যাবে।

চুয়ান্ন সালের মে মাসে পাকিস্তানি শাসকদের ৯২-ক ধারার আধা-মার্শালি আইন জারির উদ্দেশ্য ছিলো এ দেশে গণতন্ত্র কবর দেবার ব্যবস্থা নেওয়া। আর সেই পরিস্থিতিতে প্রধানত পূর্ববঙ্গে ব্যাপক হারে গ্রেফতার ও রাজনৈতিক নির্যাতনের যে মহড়া চলেছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ তা থেকে রেহাই পায়নি। বরং সময়টাকে একটু পেছনে টেনে নিয়ে বলা যায়, সাতচল্লিশ থেকে আটান্ন-এই একদশক সময়ে মেডিকেল কলেজের যেসব ছাত্র তাদের বামপন্থী রাজনৈতিক বিশ্বাস ও তৎপরতার কারণে গ্রেফতার হয়েছেন, গ্রেফতারি পরোয়ানা মাথায় নিয়ে আত্মগোপন করে অমানবিক জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছেন, কলেজ থেকে শুধু এই কারণে বহিষ্কৃত হয়েছেন

কিংবা নানা ধরনের নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন, আলীম চৌধুরী তাদের একজন। মেডিকেল কলেজের প্রগতিশীল রাজনীতি ও সংস্কৃতিচর্চার ঐতিহ্য ধারণ ও রক্ষণে আলীম কখনো পিছিয়ে থাকেনি।

এক কথায় আলীম কলেজি পড়াশোনার বাইরে তার কাজকর্মে অগ্রসর রাজনৈতিক চেতনা ও সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিচয় রেখেছে। সুবোধ, পড়ুয়া ছাত্রদের মতো মোটা মোটা ডাক্তারি বইয়ের আড়ালে জীবনের একমাত্র সার্থকতা খুঁজে নেবার মানসিকতা তার ছিলো না। তাই কখনো রাজনীতি, কখনো সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার ডাকে আরো গুটিকয় সহপাঠীর মতো তাকেও সাড়া দিতে হয়েছে, এগিয়ে যেতে হয়েছে। 'যাত্রিক'–এর সম্পাদকীয় ও অন্যান্য লেখার পরিচয় দিতে গিয়ে আলীম চৌধুরীর রাজনৈতিক চেতনার স্তরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ডাক্তারি পাস করে আলীম তখন নতুন এক কর্তব্যের দায় কাঁধে তুলে নিয়েছে। আমি তখনও আত্মগোপন অবস্থা শেষ করে আত্মরক্ষার চেষ্টায় কালক্ষয় করে চলেছি। মেডিকেল কলেজে গেলে তার সাথে দেখা হয়, গল্পে-আলাপে সময় কাটে, কিন্তু দুজনের পথ তখন দুই ভিন্ন দিকে। বেশ কয়েক বছর পর আবার দেখা মেডিকেল এসোসিয়েশনের কর্মতৎপরতার অঙ্গনে; এসোসিয়েশনের কাজকর্মে কখনো কখনো একসঙ্গে হেঁটেছি। কিন্তু এইকাজে আলীম নিজেকে অনেকখানি ব্যাপকতায় জড়িয়ে নিয়েছিলো। এসোসিয়েশনের অধিকংশ গুরুত্বপূর্ণ কাজেই তার সংশ্লিষ্টতা ছিলো, ছিলো মূল নেতৃত্বের অপরিহার্য অংশ হিসেবেই।

একটি ছোট্ট ঘটনার কথা বলি। ষাটের দশকের একেবারে শেষের দিকের কথা। এসোসিয়েশন পরিচালনায় অপেক্ষাকৃত প্রবীণদের আধিপত্যে অসন্তুষ্ট তরুণদের একাংশের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে যে দুইজন তৎকালীন তরুণ সহকর্মী নেতৃত্বের দাবি তুলেছিলো তাদের সঙ্গে বোঝাপড়ার গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিলো আলীম চৌধুরীরই পুরানা পল্টনের বাসায়। বেশ একটু রাত করেই আমরা কয়েকজন বসেছিলাম দোতলার একটি ঘরে। মনে পড়ে, ডাক্তার তৈয়ব আলী তো তাদের একটি অযৌক্তিক দাবিতে রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলীমের মধ্যস্থতায় কাজ চালানোর মতো ঐকমত্যে পৌছানো সম্ভব হয়েছিলো। ক্রমেই এসোসিয়েশনের কাজে তার ভূমিকা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলো। স্বভাবগুণে জয় করে নিয়েছিলো সে অনেককেই এবং তার মধ্যে সমর্থক বা বিরোধী উভয়পক্ষই ছিলো।

ভাবতে পারি না, এহেন আলীম চৌধুরী শেষ পর্যন্ত একাত্তরে খুনি আলবদর গোষ্ঠীর বর্বর জিঘাংসার শিকার। আশ্রয়হীন মানুষকে আশ্রয় দিয়ে মানবিক চেতনার পরিচয় রাখার পরিণামে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তির হাতে নৃশংসভাবে খুন হলো আলীম। যাকে নিজ আলয়ে আশ্রয় দিয়েছিলো নিতান্ত দাক্ষিণ্যের দায়ে, তারই ষড়যন্ত্রে এবং প্রত্যক্ষ তৎপরতায় প্রাণ দিতে হলো আলীমকে; মৌলানা ভেকধারী

আবদুল মান্নান ও তার অনুচরদের পাঞ্জা আলীমের এবং আমাদের একাধিক পরিচিতের ও বন্ধুর রক্তে রঞ্জিত হলো।

অথচ কিনা সেইসব দেশদ্রোহী ঘাতকের সুনির্দিষ্ট অপরাধের বিচার ও শাস্তি বিধানের নৈতিক সাহস আমরা দেখাতে পারিনি, যা আন্তর্জাতিক আইনেও স্বীকৃতবিধি। আরো লজ্জার বিষয়, বিচার দূরে থাক, আমাদেরই একশ্রেণীর শাসক এবং রাজনীতিক আরো এক ধাপ এগিয়ে তাদের রাজনৈতিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হননি, তাদের কাউকে কাউকে ক্ষমতার 'তখতে'ও এনে বসিয়েছেন, তাদের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির কারণ ঘটিয়েছেন।

এতসব অনাচারের ধারা পেরিয়ে আসা সত্ত্বেও এখনো আমাদের বিশ্বাস, যেকোনো ধরনের অপরাধের বিচার না হওয়াটাও এক প্রকার নৈতিক অপরাধ, যে অপরাধের দায় বাংলাদেশের এযাবৎ প্রতিষ্ঠিত কোনো সরকারই এড়াতে পারেন না। পরম শান্তিবাদী কবি রবীন্দ্রনাথও নরঘাতকদের ক্ষমা করার নীতিতে আস্থা রাখতে পারেননি; ক্ষমা তার চোখে ক্ষীণ দুর্বলতার প্রতীকরূপে ফুটে উঠেছে।

ঘাতকদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের অন্যায় দুর্বলতার প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা বলতে পারি সুনির্দিষ্ট অভিযোগে দোষী ঘাতকদের দেরিতে হলেও বিচার চাই। তাতে মানবনীতি এবং ন্যায়নীতিই প্রতিষ্ঠিত হবে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের কাছ থেকেও আমরা এই ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠা আশা করি। আশা করি, আলীম চৌধুরীর হত্যাকারী ঘাতক ও ঘাতকদের অবশ্যই বিচার হবে।

একটি আন্দোলনের স্মৃতি
ডাঃ তৈয়ব আলী

ডাঃ আলীম চৌধুরী ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর আলবদরদের হাতে নিহত হন। অনেকগুলো বৎসর অতিক্রান্ত হলেও আজো তাঁর শোকবেদনা তাঁর আপনজন, বন্ধুবান্ধব আর অনুরাগীজনদের মনে একই রকমভাবে পীড়া দিচ্ছে। এই গভীর মর্মবেদনার কিছুমাত্র উপশম ঘটাতে পারতো একটি সান্ত্বনা। আর সেটা হচ্ছে, ডাঃ চৌধুরী যে সুখী ও সুন্দর সমাজের আশায় অনুপ্রাণিত হয়ে আত্মবলিদান করে গেছেন, তাঁর সেই আশার বাস্তবায়ন। অন্য আর লক্ষ শহীদের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

ডাঃ চৌধুরী ছিলেন একজন বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী। তিনি জানতেন, সুখী-সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার জন্য জ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ প্রয়োজন। এও জানতেন তিনি, এসবের বিকাশ এবং জনসেবার ক্ষেত্রে এ দুটি বিষয়ের প্রয়োগ দেশের রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমন, বর্তমানে দেশে সীমিতভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদির বৃদ্ধি ঘটলেও সাধারণ মানুষের চিকিৎসা প্রাপ্তির সুযোগ ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। তাই ডাঃ চৌধুরী পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি সমাজ পরিবর্তনের সকল প্রগতিশীল আন্দোলন, যথা, ভাষা আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম এবং জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে পরিচালিত দেশের প্রায় প্রতিটি সংগ্রামের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। কখনও কখনও এইসব রাজনৈতিক সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি। আর এই সংগ্রাম করতে করতেই তিনি শেষ পর্যন্ত নিজের অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁর জীবনের এ দিকটি, আমরা যারা পেশাজীবী, তাদের সকলের জন্যই শিক্ষণীয়।

তাঁর কর্মময় জীবনের বহু স্মৃতি আমার মনের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। আমি এখানে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের একটি অংশকে তুলে ধরবার চেষ্টা করবো মাত্র।

১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ ১৬ বছর 'পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশন'-এর সহকর্মী হিসেবে আমরা দুজন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলাম। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রয়োগে জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য পেশাগত মানের উন্নয়নই ছিলো পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশনের লক্ষ্য। তাই এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড আবর্তিত হতো সাধারণত চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিকাশ, জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রবর্তন ও পেশাগত দাবি-দাওয়া ইত্যাদিকে ঘিরেই। জনগণের জন্য স্বাস্থ্য হচ্ছে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির মতোই একটি মৌলিক অধিকার, যা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন যখনই ব্যাপকাকার ধারণ করেছে, তখনই মেডিকেল এসোসিয়েশনের কর্মসূচি দেশের সার্বিক রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। যেমনটা হয়েছিলো বিগত '৯০-এর গণতন্ত্রের সংগ্রামের সময়, যেমনটা হয়েছিলো ১৯৫৮ সালের সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ-বিরোধী সংগ্রাম এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়। এর মধ্যে ১৯৫৮ সালে ব্যাপকাকারে কলেরা ও বসন্ত মহামারী দমন করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে গঠিত 'এপিডেমিক কন্ট্রোল কমিটি'র পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে মার্কিন মেডিকেল টিমের হস্তক্ষেপের প্রয়াস ছিলো এ দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ-পরিকল্পনার একটি অংশ। মেডিকেল এসোসিয়েশন তখন এর বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলো। আর এপিডেমিক কন্ট্রোল কমিটির সকল দেশপ্রেমিক সদস্য এর প্রতি জানিয়েছিলেন পূর্ণ সমর্থন।

এই কমিটির অন্যতম নেতা হিসেবে ডাঃ আলীম চৌধুরীর সঠিক ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ছিলো সবচেয়ে উল্লেখ করার মতো ব্যাপার। যার ফলে আমরা এই সংগ্রামে জয়যুক্ত হয়েছিলাম। এই সংগ্রাম ছিলো আসলে অপেক্ষাকৃত নীরব এবং তার ইতিহাসও অনেকেরই অজানা। পরিমাণগত দিক থেকে সাময়িক ও সীমিত বিজয়ের অধিকারী হলেও বিদেশী হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করে স্বাধীন উদ্যোগে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশব্যাপী একটি সমস্যার সমাধানের দৃষ্টান্ত—গুণগত দিকে থেকে এই ইতিহাস অত্যন্ত তাৎপর্যময়। এই ইতিহাস সকলের কাছে পৌঁছে দেয়া আমাদের কর্তব্য।

১৯৫৮ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে প্রথমে ঢাকা শহর ও পরে সারা পূর্ব পাকিস্তানে কলেরা ও বসন্ত মহামারী আকারে দেখা দেয়। সরকার তার চিরায়ত প্রথায় অভিযান চালিয়ে মহামারী নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়। পূর্ব পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশন তার স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে কেবল যানবাহনের ক্ষেত্রে স্বল্পব্যয়ী একটি মহামারী নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা পেশ করে এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার সেটি অনুমোদনও করেন। তবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মূল ব্যাপারটি নির্ভরশীল ছিলো সরকারি ও বেসরকারি সকল স্তরের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করা এবং এর জন্য ঢাকা শহর

থেকে আরম্ভ করে ইউনিয়ন পর্যন্ত সকল স্তরে এপিডেমিক কন্ট্রোল কমিটি গঠন করার ওপর।

এর প্রাদেশিক কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। সহ-সভাপতি ছিলেন সংশ্লিষ্ট পাঁচটি বিভাগ, যথা স্বাস্থ্য, অর্থ, যোগাযোগ, পুলিশ ও পাবলিক হেলথ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সেক্রেটারি বা উর্ধ্বতন অফিসার অথবা তাদের প্রতিনিধি। কমিটির সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও কয়েকটি সদস্যপদে ছিলেন মেডিকেল এসোসিয়েশনের কর্মীরা। সদস্য হিসেবে আরও ছিলেন রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও সকল সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। প্রদেশব্যাপী সকল স্তরে এ জাতীয় কমিটি গঠিত হয়। অভিযানের মূলমন্ত্র ছিলো, 'যেসব রোগ প্রতিরোধ করা যায় সেইসব রোগে আমরা, দেশবাসী একজনেরও মৃত্যু হতে দেবো না।' অভিযানের নামকরণ করা হয়, 'পেট্রিয়টিক হেলথ প্রোগ্রাম'। উল্লেখ করা প্রয়োজন, ওই মহামারী প্রতিরোধে গণচীনের সফলতার অভিজ্ঞতাকে আমরা আমাদের দেশের বাস্তব অবস্থায় প্রয়োগ করি।

যাহোক, কাজে নামার অল্পদিনের মধ্যেই মহামারী নিয়ন্ত্রণ অভিযানের অভাবিত সাফল্য লক্ষ্য করা গেলো। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, অভিযান পরিচালনায় যাঁরা হাল ধরেছিলেন, ডাঃ আলীম চৌধুরী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। শুধু তাই নয়, এই সময় অর্থাৎ গোড়ার দিকেই এই অভিযান একটি দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সম্মুখীন হলে কমিটির সরকারি ও বেসরকারি সকল সদস্যের সমবেত ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হয় এবং এক্ষেত্রে ডাঃ আলীম পালন করেছিলেন বিশেষ ভূমিকা।

বাধাটির সৃষ্টি হয়েছিলো মার্কিন একটি চিকিৎসক দলের নেতার চলমান অভিযানের প্রেক্ষাপটে বিকল্প পরিকল্পনা প্রস্তাবের ফলে। বিকল্প পরিকল্পনায় যেসব প্রস্তাবের সুপারিশ করা হয়েছিলো, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো ১. প্রাদেশিক মহামারী নিয়ন্ত্রণ কমিটির চেয়ারম্যান পদে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর স্থলে স্বাস্থ্যসচিবের অধিষ্ঠান এবং ২. জেলা থেকে আরম্ভ করে নিম্নপর্যায়ে সকল মহামারী নিয়ন্ত্রণ কমিটির বিলোপ সাধন। এই বিকল্প পরিকল্পনাটি আমাদের মূল অভিযানের নীতিমালার বিরোধী ছিলো বলে মেডিকেল এসোসিয়েশন এটি সমর্থন করতে অপারগ হয়। ফলে পরিকল্পনাটি প্রাদেশিক মহামারী নিয়ন্ত্রণ কমিটির সভায় বিবেচনার জন্য কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সভায় স্বাস্থ্যসচিবের পক্ষ থেকে বিকল্প পরিকল্পনাটি পেশ করে এর পক্ষে অনেক যুক্তি প্রদর্শন করা হয়।

মেডিকেল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ডাঃ আলীম চৌধুরী প্রস্তাবিত পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন এবং অত্যন্ত স্পষ্ট ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। দীর্ঘ আলোচনার পর বিকল্প পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায় এবং কমিটি পূর্ব গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্মসূচির প্রতি তার সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে।

এরপর মহামারী নিয়ন্ত্রণ অভিযান পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে এবং আমেরিকান চিকিৎসক দল কমিটির কর্মসূচির সাথে সমন্বয় সাধন করে তাদের কাজ চালিয়ে যায়। সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করে মহামারী নিয়ন্ত্রণ কমিটি সারা প্রদেশে পূর্ণোদ্যমে কাজ অব্যাহত রেখে অল্প সময়ের মধ্যেই কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন এবং সকলের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে। কমিটি মহামারী নিয়ন্ত্রণ অভিযানের সমাপনী পর্যায়ে পৌছে দেশ থেকে কলেরা ও বসন্ত নির্মূলের পরিকল্পনা তৈরির কাজেও নিয়োজিত হয়। এই সময় আকস্মিকভাবে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক শাসন জারি হলে মহামারী নিয়ন্ত্রণ কমিটির সকল কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়। কমিটিতে অংশগ্রহণকারী মেডিকেল এসোসিয়েশনের কোনো কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে সামরিক সরকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পাকিস্তানে তার আধিপত্য বিস্তার প্রয়াস বাড়িয়ে তোলে। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের পর এই অঞ্চলে গণতন্ত্র বিকাশের সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং জনমনে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব দৃঢ় ও বিস্তৃত হতে থাকে। এর বিরুদ্ধে তাদের স্ব-স্ব স্বার্থে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও পাকিস্তানের সামরিক আমলাদের মধ্যে যোগসাজশ ঘটে এবং ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে একটি জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারকে অপসারণ করে সামরিক আমলাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর ফলে পাকিস্তানে সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ হয় আরও পাকাপোক্ত।

ওপরে বর্ণিত দুটি ঘটনাই এ দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। উভয় ঘটনার সঙ্গেই সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ ও এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের ইতিহাস সম্পৃক্ত। প্রথমটি একটি ক্ষুদ্র বৃত্তে অর্থাৎ মহামারী নিয়ন্ত্রণ অভিযানে বিদেশী হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টা, তার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান মহামারী নিয়ন্ত্রণ কমিটির সফল সংগ্রাম এবং স্বাধীন উদ্যোগে জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি দুরূহ অভিযানে বিজয়ের অভিজ্ঞতা। অপরটি জাতীয় পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে রাজনৈতিক নেতাদের পরাজয় এবং সামরিক আমলাতন্ত্রিক শাসন সৃষ্ট নিষ্পেষণের গ্লানি ও দুর্ভোগের মর্মান্তিক উপলব্ধি।

উভয় সংগ্রামের মূলে ছিলেন ডাঃ আলীম চৌধুরীর মতো বহু নির্ভীক মানুষ। তবে দ্বিতীয়টির পরিণতিতে ক্ষমতাসীন সামরিক আমলাতান্ত্রিক সরকার সাম্রাজ্যবাদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে দেশের দুই অংশের মধ্যকার পূর্ব সৃষ্ট অর্থনৈতিক বৈষম্যকে দ্রুতহারে বাড়িয়ে একটা চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়। যার ফলে জাতীয় নিপীড়ন-বিরোধী মুক্তিসংগ্রাম অনিবার্য হয়ে পড়ে।

অত্যন্ত দুঃখজনক যে, সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ ও হস্তক্ষেপের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে এমন বিরাট অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত

স্বাধীনতার বিশ বছর সময়সীমায় দেশ ক্রমাধিক হারে সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে এবং জনগণের দুঃখ-দারিদ্য ও বঞ্চনা থেকে মুক্তির আশা কেবলই মুছে যাচ্ছে। এই ব্যর্থতার কারণ কোথায়, চিন্তাচেতনার সব ধরনের সঙ্কীর্ণ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এর অনুসন্ধান করতে হবে আমাদের।

তবে এই ব্যর্থতার কারণ যাই হোক, এর জন্য ডাঃ আলীম চৌধুরী ও লক্ষ লক্ষ শহীদের ত্যাগ, সচেতনতা ও আদর্শের উজ্জ্বলতা এতটুকুও ম্লান হবার নয়। তাঁদের ত্যাগের অনির্বাণ দীপ্ত শিখার আলোকেই আমরা দেখতে পাই যে, সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য ও হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করে জাতির স্বাধীন বিকাশ ছাড়া তাদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আর এই সংগ্রামে জয়লাভ করতে হলে আমাদের কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তসহ সকল দেশপ্রেমিক জনগণের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে।

তাঁর শূন্যতা

ডাঃ সারওয়ার আলী

মির্জাপুর থেকে ঢাকায় স্থায়ীভাবে আসার কিছুদিনের মধ্যে ডাঃ আলীম চৌধুরী ঢাকা মেডিকেল কলেজের চক্ষু বিভাগে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। একই সময় তিনি নির্বাচিত হন পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশনের পূর্বাঞ্চল শাখারও সাধারণ সম্পাদক।

সেসময় আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ক্লিনিক্যাল পর্যায়ের ছাত্র হিসেবে মেডিকেল এসোসিয়েশনের, বিশেষ করে সম্মেলনের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে কাজ করতাম। হঠাৎ করে সেই সময়কার প্রবীণ প্রজন্মের কাছে একেবারে নতুন একজনকে সরাসরি এত বড় পদ দেওয়ায় বেশ খটকা লাগে। এই সূত্রেই তখনকার মেডিকেল এসোসিয়েশনের প্রাণপুরুষ ডাঃ তৈয়ব আলীর কাছে প্রথম ডাঃ আলীম চৌধুরীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অতীত সম্পর্কে শুনি। শুনি ছাত্রাবস্থায় ভাষা আন্দোলনের সময় তাঁর গৌরবময় আর সাহসী ভূমিকার কথাও।

ডাঃ তৈয়বের কাছ থেকে আরো জানতে পারি, মেডিকেল এসোসিয়েশনের পূর্বাঞ্চল শাখার গোড়াপত্তনে যাঁরা প্রাণপাত করেছেন, ডাঃ আলীম চৌধুরী ছিলেন তাদের অন্যতম। তখন পুরোনো ঢাকায় মেডিকেল এসোসিয়েশনের যে দপ্তর ছিলো, তিনি ছিলেন তার প্রায় সার্বক্ষণিক কর্মী।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষক এবং মেডিকেল এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক থাকার সময় পরবর্তীকালে দিনে দিনে তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। একবার ডাঃ সানাউল্লাহ, পরে ডাঃ নূরুল আলমের পাশাপাশি মেডিকেল এসোসিয়েশনের সুভ্যেনির ও জার্নালের প্রুফ দেখার বাড়তি দায়িত্ব বর্তায় আমার ওপর। সেই তখন মুদ্রিত প্রতিটি বিষয়ে ডাঃ আলীমের খুঁটিনাটি যেসব পরামর্শ পেয়েছিলাম, স্মরণে এখনো তা জ্বলজ্বলে।

ডাক্তারি পাস করার পর তিনিই আমাকে মেডিকেল এসোসিয়েশনে টেনে আনেন। ছাত্রজীবনের রেশ ধরে আমার সরাসরি রাজনীতি করার প্রবণতা সেই তখন বেশ প্রবলই

ছিলো। ডাঃ আলীম দিনের পর দিন ধৈর্যের সাথে জাতীয় রাজনীতির স্বার্থেই পেশাজীবীদের সংগঠন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বুঝিয়েছেন। মেডিকেল এসোসিয়েশনে তখন অপেক্ষাকৃত প্রবীণদের নেতৃত্ব। তাঁদের আনাগোনাও ছিলো চোখে পড়বার মতো। ডাঃ আলীমই এসোসিয়েশনের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর এই প্রথম পরিকল্পিতভাবে সংগঠনে আমাদের মতো নবীনদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর ব্যাপারে প্রয়াসী হন।

ডাঃ মান্নান, ডাঃ কাসেম আর ডাঃ তৈয়ব আলীরও এ ব্যাপারে বিশেষ সমর্থন ছিলো। তবে ডাঃ আলীম ছিলেন এ বিষয়ে অতিরিক্ত আগ্রহী। বিশেষ করে প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনার অধিকারী তরুণরা সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করুক, সেটা তিনি মনে-প্রাণে কামনা করতেন। প্রগতিশীল চিন্তার মানুষ করাচির ডাঃ এ. হাসমী তখন পাঞ্জাবি প্রার্থীকে হারিয়ে নিখিল পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। ডাঃ আলীম চৌধুরী ছিলেন নিখিল পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশনের যুগ্মসম্পাদক। কিছুদিন আগে বিদেশে এক সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে ডাঃ হাসমীর কাছেই শুনেছি, মেডিকেল এসোসিয়েশনের নবীন প্রগতিশীল ডাক্তারদের সমাবেশ ঘটানোর জন্য, এমনকি স্বাধীনতার আগে আমাকে সাধারণ সম্পাদক করার জন্যও ডাঃ আলীম তুমুল তর্ক করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে আমার মতো অনেক নবীন ডাক্তারকে পি.এম.-এ-তে যুক্ত করা এবং সংগঠনে নবীন ডাক্তারদের সমাবেশ ঘটানোর বিষয়ে তাঁর ছিলো বিশেষ অবদান।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর কিংবা ডাঃ আলী আফজাল খানের (নাক-কান-গলা-বিভাগের অধ্যাপক) কক্ষে প্রায় প্রতিদিন ওয়ার্ড রাউন্ডের পর আড্ডা জমতো। ডাঃ ফজলে রাব্বি ছিলেন এই আড্ডার মধ্যমণি। আমরা কখনো-সখনো সেই আড্ডায় বসবার সুযোগ পেয়েছি। ওই আড্ডায় জাতীয় রাজনীতি থেকে শুরু করে মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থাও ছিলো সাধারণত আলোচনার বিষয়বস্তু। যতদূর মনে পড়ে, প্রধানত ডাঃ রাব্বি ও ডাঃ আলীম চৌধুরীর আগ্রহে আমাদের ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে '৬৭ সালে 'গণমুখী মেডিকেল শিক্ষাব্যবস্থা' শীর্ষক প্রথম আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা সভায় তাঁরাই প্রধান বক্তা হিসেবে গণমুখী মেডিকেল শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি আর ছাত্রদের ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। সে সময় মেডিকেল এসোসিয়েশনের পূর্বাঞ্চল শাখার সভাপতি ছিলেন ডাঃ কে. এ. মনসুর আর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ডাঃ আলীম চৌধুরী।

এসোসিয়েশন তখন স্বাস্থ্যনীতির একটি খসড়া তৈরি করছিলো। পাকিস্তানের তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মেডিকেল শিক্ষকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করার প্রস্তাব

সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করছিলেন। ডাঃ মনসুর ছিলেন মেডিকেল কলেজের অভ্যন্তরে 'ইনস্টিটিউশনাল প্র্যাকটিস'-এর প্রবক্তা। তিনি এই প্রথার নাম দিয়েছিলেন 'জিওগ্রাফিক্যাল প্র্যাকটিস'। এ সম্পর্কে ডাঃ মনসুর আলোচনা সভায় বক্তব্যও রাখেন। ভারি মজার ব্যাপার, আলোচনা সভায় এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ আলীম চৌধুরী এই প্রথার প্রবল আপত্তি করে বলেন, "Geographical Practice will be a historical blunder" তাঁর মতে এই প্রথা দুর্নীতি বাড়াবে। শুধু তাই নয়, সাধারণ রোগীদের তুলনায় ফি দিতে সক্ষম এ ধরনের রোগীর চিকিৎসার ব্যাপারে সরকারি ডাক্তাররা অতিরিক্ত মনোযোগী হয়ে পড়বেন। তিনি একই হাসপাতালে পেয়িং ও নন-পেয়িং প্রথার বিরোধিতা করে সরকারিভাবে প্রথম লাভজনক পেয়িং হাসপাতাল গড়ে তোলার প্রস্তাব করেন। পরবর্তীকালে মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভায় এই প্রস্তাব গৃহীতও হয়।

ডাঃ আলীম চৌধুরী ছিলেন মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বায়ত্তশাসনের প্রবক্তা। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের সময় এগারো দফা প্রণয়নকালে তিনি আলাদাভাবে আমাদের ডেকে গণমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও মেডিকেল কলেজে স্বায়ত্তশাসনের দাবি অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শও দিয়েছিলেন।

ডাঃ আলীম অত্যন্ত রাজনীতিসচেতন মানুষ ছিলেন। পুরানা পল্টনে তাঁর চেম্বারে বহুবার তাঁর সাথে প্রগতিশীল রাজনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করবার সুযোগ ঘটেছে। এ-সময় তাঁর চেম্বারের পেছনের কক্ষে কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বেরও সাক্ষাৎ পেয়েছি। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর ছিলো অতিরিক্ত আশাবাদ। এ-সময়কার রাজনৈতিক আন্দোলন, বিশেষত ছাত্র আন্দোলন বিভিন্নভাবে তাঁর সর্বাত্মক সমর্থন পেয়েছে। আসাদের মৃত্যুর পর লক্ষ্য করেছি তাঁর গভীর উৎকণ্ঠার বিষয়টি। স্বাধীনতা সম্পর্কে তখনই তিনি এতো আশাবাদী ছিলেন যে, স্বাধীনতার পর স্বাস্থ্যব্যবস্থার স্বরূপ কী হওয়া উচিত, সে বিষয়ে '৭০ সালের গোড়ার দিকে আমাদের সাথে দীর্ঘ আলোচনাও করেছেন।

আমার সাথে ডাঃ আলীম চৌধুরীর সর্বশেষ আলাপ হয় একাত্তরের পঁচিশে মার্চ সন্ধ্যায়। সংঘাত আসন্ন, এই উপলব্ধি থেকে তিনি সারা শহরকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে মেডিকেল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জরুরি মেডিকেল স্কোয়াড গড়ে তোলার পরিকল্পনাও করেন। শুধু তাই নয়, কয়েকদিন আগ থেকে এজন্য ওষুধ কোম্পানিগুলোর কাছ হতে মেডিকেল এসোসিয়েশনের নামে বেশকিছু ওষুধপত্রও তাঁর নেতৃত্বে যোগাড় করা হয়। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় ফোনে এই কাজটি সংগ্রাম কমিটিগুলোর সাথে আলাপ-আলোচনা করে ২৬ মার্চ থেকে শুরু করারও তাগিদ দেন। মেডিকেল এসোসিয়েশনে রক্ষিত এইসব ওষুধ পরবর্তীকালে আমরা মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহার করবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

এই সুবাদে আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। '৬৯ ৭০-এর গণআন্দোলনের সময় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদকে প্রায়ই তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে কর্মসূচি প্রচার করতে হতো। সে সময় ফটোকপি করার সুযোগ তেমন ছিলো না। আমি তখন মেডিকেল এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক। কিন্তু তারপরও আমার যথেষ্ট দ্বিধা ছিলো, মেডিকেল এসোসিয়েশনের সাইক্লোস্টাইল মেশিন একাজে ব্যবহার করা উচিত হবে কি না। আশ্চর্যের ব্যাপার, ডাঃ আলীম চৌধুরী এবং ডাঃ তৈয়ব আলীর উৎসাহেই এসোসিয়েশনের মেশিনটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র সংসদের অফিসে শেষ পর্যন্ত স্থানান্তরিত হয় এবং এই মেশিনের মাধ্যমেই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচি প্রায় প্রতিদিনই বিলি করা হতে থাকে। দুঃখের বিষয়, ২৫ মার্চে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর নগ্ন হামলার পর এই মেশিনটি আমরা রক্ষা করতে পারিনি।

ডাঃ আলীম চৌধুরী আমাদের পথিকৃৎ। আজ দেশ ও জাতির এই সঙ্কটকালে তাঁর মতো সচেতন সংগ্রামী বুদ্ধিজীবীর প্রয়োজন ছিলো অত্যন্ত বেশি। তাঁর শূন্যতা আমাদের মর্মবেদনাই শুধু বাড়ায়।

ডাঃ আলীম : নেপথ্যের মানুষটি

খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস

চক্রান্তটায় আগরতলা জড়িত, না পিণ্ডি, সে প্রমাণ ইতিহাস একদিন দেবে। কিন্তু আমি মনে করি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার যদি একবিন্দুও সত্যতা থাকে, তাহলে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ববাংলার একজন প্রকৃত মার্কসবাদী। মানিকভাই বা আপনি কি মনে করেন, জানি না, তবে আমার বক্তব্যের সত্যতা আমি প্রমাণ করতে পারি। কথাগুলো বলে ডাক্তার আলীম চৌধুরী আমাদের উভয়ের দিকে তাকালেন। আলোচনায় বসলে আলীমের বক্তব্যের মাধুর্য সকলকেই আকর্ষণ করতো। কাজেই আমি গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাঁর প্রতিটি কথা শুনছিলাম। কিন্তু মানিকভাই একটু অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন। রাত অনেক হয়েছে। বৃষ্টিও থামছে না। অথচ ইত্তেফাক অফিসে তাঁর একবার না গেলেই নয়। বারবার ঘড়ি দেখে তিনি এক সময় উঠতে উঠতে বললেন, ভদ্রলোক যখন এলেন না, আমার মনে হয়, দু-তিনদিন পর আমরা আবার বসি।

মানিকভাই ইত্তেফাক অফিসে চলে গেলেন।

তাঁকে বিদায় দিয়ে ডাক্তার হাসতে হাসতে ফিরে এলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, মানিক মিয়ার পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন? আমি কিন্তু দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ক্রমেই আশাবাদী হয়ে উঠছি। আন্ডারগ্রাউন্ড নেতাদের সঙ্গে বৈঠকগুলো জাতির জীবনে কল্যাণকর হয়েছে বলতে হবে। কারণ, তাঁদের কাছ থেকে তিনি যে শুধু সংগ্রামী প্রেরণাই লাভ করেছেন, তাই নয়, সংগ্রামী ঐক্যেরও প্রেরণা পেয়েছেন। কাজেই বামপন্থী ঐক্যজোট প্রায় অনিবার্য। আর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের অর্থই হলো দেশের গণতান্ত্রিক শক্তির কাছে স্বৈরতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া-উপনিবেশবাদী শক্তির পরাজয় এবং বাঙালির জাতীয় মুক্তি অর্জন।

কথা হচ্ছিলো ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে। ততোদিন সমগ্র পাকিস্তানের বামপন্থী আন্দোলন ও সংগঠন দুভাগে বিভক্ত। বিভক্ত হয়েছে নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে। তাঁদের নীতি ও আদর্শ ছিলো মূলত আন্তর্জাতিক। কিন্তু সেই আন্তর্জাতিক নীতি ও আদর্শ জাতীয় জীবনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে জাতীয় রাজনীতিতে চরম

মতানৈক্য, এমনকি কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি পর্যন্ত। সাধারণ কর্মীমহলে নিদারুণ হতাশা। কোনো কোনো মহলে এমনকি জিঘাংসাপরায়ণতাও।

দেশের রাজনৈতিক জীবনের এই নৈতিক অবনতি রোধ করার জন্য কোনো কোনো দেশপ্রেমিক আপনা থেকেই উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ডাক্তার আলীম চৌধুরী তাঁদেরই একজন। সংখ্যায় তাঁরা খুবই অল্প। কিন্তু পর্দার অন্তরালে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা তাঁরা পালন করে গেছেন,.তার যথাযথ স্বীকৃতি দেয়া স্বাধীন বাংলার প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের নৈতিক দায়িত্ব ও পবিত্র কর্তব্য।

পাকিস্তানি আমলে বাংলাদেশের প্রখ্যাত চক্ষুবিশারদ ডাক্তার আলীম চৌধুরীর পরিচয়.ছিলো দুটি—চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও রাজনীতি বিশেষজ্ঞ। ঢাকা মেডিকেল কলেজের চক্ষু বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর ছাড়াও অসংখ্য চক্ষু রোগীর কাছে তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি ছিলো অপরিসীম। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, ছাত্র ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের তহবিলে তাঁর দানের বদান্যতা ছিলো সর্বজনস্বীকৃত। নির্যাতিত রাজনৈতিক ও ছাত্রনেতা, এমনকি সাধারণ কর্মীদের চক্ষু চিকিৎসার জন্যেও তাঁর নিজের চেম্বারের দরজা সদাসর্বদা ছিলো উন্মুক্ত। কাকে কাকের মাংস খায় না- এই বলে একটি মৃদু হাসিতে গোলগাল মুখখানি উদ্ভাসিত করে তিনি সবিনয়ে ফিরিয়ে দিতেন তাঁর প্রাপ্য ফিসের ষোলটি টাকা। বলতেন, দেশের রাজনৈতিক জীবনে কোনো অবদানই তো রেখে যেতে পারলাম না। সামান্য একটু চিকিৎসা, তাও যদি আপনাদের মতো সংগ্রামীদের বিনা পয়সায় করতে না পারি, তবে জীবনের মূল্যই যে আর থাকে না!

কথায় কথায় তিনি উদাহরণ দিতেন ডাক্তার নন্দী, প্যাথোলজিস্ট ডাক্তার আবদুল ওয়াদুদ, ডাক্তার রাব্বি প্রমুখ কতিপয় চিকিৎসাবিদের কথা, যাঁরা নির্যাতিত দেশপ্রেমিকদের চিকিৎসার ব্যাপারে একই উদারনীতি অনুসরণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না।

সেই আলীম চৌধুরী একটি বৈঠকের আয়োজন করেছেন। আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিন পক্ষের তিনজনকে। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ কারাগারে থাকায় তার পক্ষ থেকে কথা বলবেন মানিকভাই। ন্যাপ থেকে ডেকেছেন আমাকে এবং বেআইনি ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে আসার কথা ছিলো আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে জনৈক নেতার। এ ধরনের একটি বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অসম্ভব গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে এবং আমন্ত্রিতরা বৈঠকস্থলে যাবার আগে কেউ অন্যজনের পরিচয় জানবেন না, এ রকম সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো। তেমনি গোপন রাখা হয়েছিলো আমন্ত্রণের উদ্দেশ্য। আলীম চৌধুরী শুধু বলেছিলেন ঃ বিশেষ কিছু কথা ছিল, একটু আসুন না। এক সঙ্গে বসে এক কাপ চা খাবো।

আমি যখন পৌছাই তার মিনিট পাঁচেক পরেই উপস্থিত হন মানিকভাই। তিনি সানন্দে বলে উঠলেন : তোমাদের পীর হাবিবুর রহমান সেদিন দেখা করার পর তোমাদেরকে আমি মনে মনে খুঁজছি। তা ভালোই হলো। এখন বলো দেখি পাকিস্তানি শালাদের বাড়াবাড়ি নিয়ে কি করা যায়। মোনাইমাটারে তো আর বরদাস্ত হয় না। বিশ্বাস করো, এক এক সময় রাগে নিজের গোস্ত নিজেরই কামড়াতে ইচ্ছে করে।

বছরটি ছিলো স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট আয়ুবের 'গোল্ডেন ডিকেড' অর্থাৎ স্বর্ণ যুগ উদযাপনের তোড়াজোড়ের বছর। আবদুল মোনেম খান তখন পাকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ, দুর্নীতিপরায়ণ আমলাতন্ত্রবাদ, জঙ্গি সমরবাদ, পাঞ্জাবি উপনিবেশবাদ এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের অবাধ লুণ্ঠনের ক্ষেত্র—তাদের সাধের পূর্ব পাকিস্তানের লাট বাহাদুর। সেই লাটের দাপট এবং আমেরিকার আটটি ধনিক পরিবারের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের অটুট প্রহরী সি.আই. এ. ও পেন্টাগনের সক্রিয় চক্রান্তের ফলে বাঙালির জাতীয় ঐক্য হয়ে পড়েছিলো ছিন্নভিন্ন। লাটের পদে সমাসীন হবার আগেভাগে তিনি নাকি তাঁর প্রভু আয়ুবকে কথা দিয়ে এসেছিলেন এই বলে, আর কিছু না পারেন অন্তত পক্ষে বাঙালির বাঙালিত্ব তিনি ঘুচিয়ে দেবেন।

কাজেই পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্র বাংলাদেশে যে কাজটি তাদের লাট আবদুর রহমান সিদ্দিকী, চৌধুরী খালেকুজ্জামান, ফিরোজ খান নুন, জেনারেল আজম খান ও গোলাম ফারুকের মাধ্যমে সম্পাদন করতে পারেনি, সেই বাঙালিত্ব ঘুচিয়ে দেবার দুর্জয় ব্রত নিয়ে এগিয়ে আসেন কৈলাকা কৈবর্তের পৌত্র এবং কুড়াইলা খাঁর পুত্র আবদুল মোনেম খান।

গ্রামবাংলায় প্রবাদ আছে বাঁশ ও কুড়াল সম্পর্কে। একদা ঝাড়ের বাঁশ মিনতি করে কুড়ালকে বলেছিল, ভাই, তুমি অমন করে আমাকে কেটো না।

উত্তরে কুড়াল বলেছিলো : বন্ধু, আমার কী ক্ষমতা, আর কীইবা আমার অপরাধ! তোমার জাতভাই বাঁশ ডাণ্ডা হয়ে যদি আমাকে কাজে না লাগাতো, তবে তুমি অক্ষতই থাকতে পারতে।

শোনা যায়, ঢাকার সদর উত্তর মহকুমার শ্রীপুর অঞ্চলের কৈলাকা কৈবর্ত লোক হিসেবে মন্দ ছিলো না। জাল ফেলে মাছ ধরে হাটে-বাজারে বিক্রি করে কিংবা চাষাবাদ করে সংসার চলতো তার। কিন্তু পুত্রধন নির্বিবাদে মানুষ খুন করে পলাতক হয়। পরে সেই পুত্র পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ধর্মান্তরিত হয় এবং কুড়াইলা খাঁ নাম ধারণ করে। আর সেই কুড়াইলা খাঁর সপুত্র আবদুল মোনেম খান পাকিস্তানি কুড়ালে ডাণ্ডার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

বাংলাভাষায় আত্মীকৃত আরবি, ফার্সি, উর্দু, ইংরেজি অন্যান্য বিদেশী শব্দ অক্ষুণ্ন রেখে তিনি উদ্যোগ নিলেন বাংলা শব্দের ব্যবহার প্রতিরোধ করতে। আর সেই সঙ্গে

চললো বাঙালির মন থেকে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি মুছে ফেলবার আয়োজন। কিন্তু দেখলেন, বাঙালির বাঙালিত্ব ও তার ভাষার শেকড় এতো গভীরে প্রোথিত যে, তাকে প্রবলভাবে নাড়া দিতে গিয়ে তিনি নিজেই নড়ে উঠছেন বার বার। তখন ধরলেন অন্য কায়দা। এবার একদিকে চললো রোমান হরফে অর্থাৎ ইংরেজি হরফে বাংলাভাষা চালুর সেই মার্কিনি কর্মসূচি কার্যকর করার চেষ্টা, অন্যদিকে বাঙালির ঐক্যের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান। এই উভয়বিধ কাজে তিনি কিছু কিছু বুদ্ধিজীবীর সহায়তা লাভ করেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আজ স্বাধীন বাংলাদেশের উচ্চ রাষ্ট্রীয় পদ ও মর্যাদায় সমাসীন।

সে কথা এখন থাক।

এমনি ধরনের প্রতিপক্ষের অপ্রতিহত শক্তির মোকাবিলায় বাঙালির জাতীয় ঐক্য রচনা করা ছিলো সেদিন প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। ঐক্যের রাজনৈতিক কাঠামো তৈরির যে সাংগঠনিক ভিত্তি সেদিন দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক শক্তি দেশবাসীর সম্মুখে পেশ করেছিলো তার সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিলো আওয়ামী লীগের সঙ্গে মওলানা ভাসানী ও মোজাফফর আহমদ পরিচালিত দুই ন্যাপ ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট এন. ডি. এফ-এর সংযুক্তি সাধন করে সংযুক্ত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করা। এর ফলেই দেশপ্রেমিক বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া, শ্রমিক এবং কৃষকশ্রেণীর সঙ্গে সংগ্রামী বুদ্ধিজীবীদের ঐক্য মোর্চা, জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট বা দেশপ্রেমিক ফ্রন্টের জন্ম দেয়া সম্ভব হবে। জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট বা দেশপ্রেমিক ফ্রন্টের ধ্যান-ধারণা বাংলার মাটিতে জন্মলাভ করে ইতিহাসের পথ ধরে, সংগ্রামী ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে। নিপীড়িত সংগ্রামী জনগণের জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন এবং জাতীয় স্বাধীনতা বাস্তবায়নের প্রধানতম পদক্ষেপ হিসেবে জাতীয় অর্থনীতি বা স্বনির্ভর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা কোনো কোনো কৃষিনির্ভর ও পশ্চাৎপদ দেশে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের মূল দর্শন ও বিজ্ঞানরূপে উচ্চারিত মহামতি লেনিনের যে শ্লোগান, দুনিয়ার মজদুর ও নিপীড়িত জনগণ এক হও—সেখান থেকেই দেশপ্রেমিক সংগঠন বহু শ্রেণীভিত্তিক জাতীয় ফ্রন্ট গঠনের চিন্তার সূত্রপাত।

মহান লেনিনের জীবৎকালেই শ্রমিক, কৃষক ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে সমাজের সকল স্তরের দেশপ্রেমিক জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে বৈপ্লবিক সংগ্রাম শুরু করেন বুলগেরিয়ায়। সেটা ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কথা। ওই সময় যে অভ্যুত্থান ঘটে, সেটা ঘটে বুলগেরিয়ার ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে। ওই সরকারের নেতৃত্বে ছিলো সে দেশের পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ ও পাদরিতন্ত্রের মুখ্য ব্যক্তিবৃন্দ। প্রতিক্রিয়াশীল সেই সরকারের বিরুদ্ধেই ছিল সেদিনকার বুলগেরীয় জনগণের বিপ্লবী অভ্যুত্থান।

স্বদেশে শ্রমিক ও নিপীড়িত জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তি সচক্ষে অবলোকন এবং সেই বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকেই বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টি ও তার

অবিসংবাদিত নেতা গিয়োর্গি ডিমিট্রিভ পরবর্তীকালে যে 'ফাদার ল্যান্ড ফ্রন্ট' গঠন করেন, সেখানে থেকেই ঐক্য ফ্রন্ট গঠনের প্রেরণা লাভ করেন অন্যান্য দেশের সংগ্রামী দল ও তাদের নেতৃবৃন্দ। এরই দৃষ্টান্তে পরবর্তী পর্যায়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও মাও সেতুংয়ের নেতৃত্বে নয়া গণতান্ত্রিক জাতীয় ফ্রন্ট কিংবা জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠিত হতে দেখা যায় চীনের মাটিতে। আরো পরে মার্শাল জোসেফ ব্রজ টিটোর নেতৃত্বে যুগোশ্লাভিয়ায় জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট, ফরাসি দেশে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী পপুলার ফ্রন্ট এবং পূর্ব পাকিস্তানে স্বৈরতন্ত্রী মুসলিম লীগ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্ত ফ্রন্ট গড়ে ওঠে। আর জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের ঐতিহাসিক সাফল্যের সবচাইতে উজ্জ্বল নজির স্থাপন করেছেন ভিয়েতনামের অমর জনগণ। বিশ্বের বৃহত্তম সামরিক শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের তাবেদার সরকারের সক্রিয় সামরিক বৈষয়িক-সাহায্যে বলীয়ান হয়ে অবতীর্ণ হয় দক্ষিণ ভিয়েতনামের মাত্র দেড় কোটি মানুষের বিরুদ্ধে। সত্যি কথা বলতে কি, দক্ষিণ ভিয়েতনামের সংগ্রামী জনগণের পেছনে নৈতিক ও বৈষয়িক সমর্থনদান করেন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের সরকার ও জনগণের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবির। কিন্তু সে যুক্তিকে ছোট করে না দেখেও বড় করে দেখা হয় ভিয়েতনামের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে বাংলাদেশেরও মূল শক্তি ছিলো তার জাতীয় ঐক্য।

আয়ুবী দশকে বাংলাদেশের প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের মনে প্রশ্ন ছিলো, আমাদের মুক্তির পথ কি? আর সে প্রশ্নের জবাব ছিলো তখনকার বাংলাদেশের মার্কসবাদীদের কাছে-মুক্তির পথ একটিই এবং সে হলো জাতীয় ঐক্য, জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট বা দেশপ্রেমিক ফ্রন্ট।

পাকিস্তানি একচেটিয়া ধনিকশ্রেণী এবং সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের দালাল-অনুচরদের একটি শক্তিশালী অংশ তখনকার দিনে তৎপর হয়ে উঠেছিলো বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে। বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সরকারি, আধা-সরকারি সংস্থা ও সংগঠনে তাদের অনুপ্রবেশ এমন সংঘবদ্ধ ছিল যে, বার বার জাতীয় ঐক্য গঠন প্রচেষ্টা তাদের হাতে বানচাল হয়। সেদিন কায়েমি শক্তি ওটুকু করেই থেমে থাকেনি। তারা অনেক কর্মী ও নেতার বিরুদ্ধে বাজারে ছড়াতে থাকে সন্দেহ ও অনাস্থা উদ্রেকী অসংখ্য গুজব ও মিথ্যে অভিযোগ। দুর্বল শরীরে মনের অবস্থাও দুর্বল হয়। ব্যক্তিগত জীবনের এই সত্য কথাটি প্রতিভাত হতে দেখা যায় জাতীয় জীবনেও। কাজেই জাতীয় জীবনের সেই দুর্বল ও নাজুক পরিস্থিতিতে কায়েমি স্বার্থবাদী মহল প্রচারিত পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও অনাস্থা প্রধানতম অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে। সমগ্র পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী মহলেই বিদ্যমান ছিলো সেই দুরবস্থা। তবে বাংলাদেশের দুরবস্থা ছিলো যেমন মারাত্মক, তেমনি নজিরবিহীন।

তবুও আশাবাদ ছিলো আলীম চৌধুরীর।

ইতিহাসের নিয়ামক শক্তি সংগ্রামী জনগণ। ইতিহাস বিশ্লেষণে এই মার্কসবাদী প্রত্যয়ে দৃঢ় ছিলো তাঁর চিন্তাধারা। সেই চিন্তাধারার যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায় যখন তিনি উভয় পাকিস্তানের বাস্তব অবস্থা ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনার সূত্রপাত করেন।

আলীম চৌধুরী বলেন, পাঞ্জাবের কথাই ধরুন। পাঞ্জাবের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তির বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে সেই দেশেরই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। সায়গল গ্রুপের মতো একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী কিংবা কালাবাগের আমির মোহাম্মদ খান অথবা সুলতানের দৌলতানাদের মতো সামন্তবাদী শ্রেণী অবাধে শোষণ করছে তাদেরই দেশের শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য মেহনতি শ্রেণীকে তাদের মস্তকের ওপর নির্মম প্রভুত্ব চালিয়ে তাদেরই দেশের আমলা কর্মচারি, তাদেরই সেনাবাহিনী। আবার তাদের সকলের ওপর রয়েছে নিউইয়র্ক, লন্ডন, প্যারিস, বন, রোম ও টোকিওর একচেটিয়া পুঁজিবাদীরা। সর্বোপরি, পাকিস্তানে নিয়োজিত বিদেশী পুঁজি ধনতান্ত্রিক বিশ্বের যে কেন্দ্র থেকেই আমদানি হোক আসলে তা বিশ্ব পুঁজিবাদেরই অংশ। আর বিশ্ব পুঁজিবাদের বিশ্বনায়ক হলো সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া উপনিবেশবাদী আমেরিকার আটটি একচেটিয়া ধনিক পরিবার। কাজেই হেনরি ফোর্ডের গাড়ির জায়গায় আজ যদি টয়োটা-ভক্সহল-ভক্সওয়াগনের ছড়াছড়ি দেখা যায় পিণ্ডি-করাচি-লাহোর কিংবা ঢাকার রাজপথে, তবে আমেরিকার ফোর্ডকার্নেগি-রকফেলারের লোকসান কিসের, বরং পশ্চিম জার্মানির প্রকৌশলীদের উন্নততর কলা-কুশলী এবং জাপানের মতো দেশের সস্তা কাঁচামাল ও সস্তা শ্রমের বিনিময়ে প্রস্তুত গাড়ি বা অন্যান্য পণ্যে তাদের মুনাফা অধিক। আর এই নিয়ে দেখবেন একদিন শুরু হবে মার্কিন পৃষ্ঠপোষিত পাকিস্তানের মতো অন্যান্য দেশের ধনিক পরিবারগুলোর সঙ্গে আমেরিকার ধনিকদের স্বার্থদ্বন্দ্ব। এছাড়াও স্বার্থের দ্বন্দ্ব চলছে ভারত, পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের মতো বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক স্বার্থ নিয়ে মার্কিন ও বৃটিশ পুঁজির মধ্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গৃহীত বৃটিশ সরকারের ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে সেদেশের ধনিকদের মাথার ওপরে। ফলে শুধু বাজার হাত ছাড়াই নয়, আজ বৃটিশ ধনিকশ্রেণী অধমর্ণ এবং মার্কিন ধনীরা উত্তমর্ণ। এ ধরনের বৈষম্যমূলক সম্পর্কের দরুন শেষ পর্যন্ত আঘাত পড়বে স্ট্যার্লিং ও ডলারের আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর। তার ফলে মাথা গরম হবে উভয় দেশের ধনিক শ্রেণীর।

এটা ছিলো ডাক্তার আলীমের মূল বক্তব্যের অন্যতম। তিনি বলছিলেন, বিশ্ব পুঁজিবাদের অভ্যন্তরে যে অলংঘনীয় দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছে, পাকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণীও তার কুফল থেকে বাদ পড়বে না। আর আমরা বাঙালিরা যদি তার সুযোগ গ্রহণে ব্যর্থ হই, তবে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না। ধরুন, পশ্চিম জার্মানীতে নিয়োগকৃত বিদেশী পুঁজির মধ্যে আমেরিকার আট পরিবারের পুঁজিই

যেখানে রয়েছে শতকরা ষাট ভাগ, সেখানে পশ্চিম ইউরোপের বাজার ও শিল্পস্বার্থ নিয়ে কোনো-না-কোনো দিন ইঙ্গ-মার্কিন, ফরাসি-জার্মান অন্তর্দ্বন্দ্ব অবধারিত। তেমনি অবধারিত তাদের সে দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ। জেনারেল দ্য গলের মার্কিন বিরোধিতার মূল রয়েছে আমেরিকার পুঁজিপতিদের সঙ্গে ফরাসি পুঁজিপতিদের স্বার্থের কোন্দল। একই ধরনের কোন্দল ও স্বার্থদ্বন্দ্বের বিস্তারলাভ ঘটবে এবং পাকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজিবাদও তার প্রভাব থেকে রেহাই পাবে বলে মনে হয় না। তাদের মুক্তির কোনো কারণ দেখি না। কাজেই তাদের ওপর সজোরে আঘাত হানার সুদিন সমুপস্থিত। পাকিস্তানের একচেটিয়া বাইশ পরিবারের বিরুদ্ধে একটি প্রচণ্ড আঘাত আমি দেখতে পাচ্ছি শেখ মুজিবের ছয় দফা প্রস্তাবের মধ্যে। মুজিবের ছয় দফার বিপ্লব সফল হলে দেখবেন পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী কেমন করে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বড় মোক্ষম বস্তু, মোক্ষম দাওয়াই। কোনো কোনো ব্যাপারে আমার কিছু কিছু মতবিরোধ থাকলেও শেখ মুজিবকে আমি মনে মনে অভিনন্দন জানাই।

আলীম চৌধুরী এখানেই থামলেন না।

তিনি বলে চলেছেন, বাংলাদেশে আমাদের কতকগুলো সুবিধা রয়েছে। এই ধরুন, এখানকার পুঁজিবাদী গোষ্ঠী সব বিদেশী—পাকিস্তানের অর্থাৎ পশ্চিমাঞ্চলের। তারা কোনোদিন বাংলাদেশকে আপন দেশ বলে মনে করে না। তেমনি বাঙালিরাও তাদেরকে মনে করে না আপনজন বলে। এদেশের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড গড়ে তোলার ব্যাপারে এমন বাস্তব অবস্থা ও তার সুবিধাগুলো কাজে লাগানো দরকার।

এবার আমি তাঁকে একটি প্রশ্ন করি। আমার প্রশ্ন ছিলোঃ আপনি একজন মার্কসবাদী। আপনি কি মনে করেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের শ্লোগান তোলা এই মুহূর্তে উচিত কিংবা ফলদায়ক হবে?

ডাক্তার আলীম হেসে ফেললেন। তারপর হাসতে হাসতেই বললেন, দেখুন, এ প্রশ্নের জবাব আপনার জানা। কারণ এ নিয়ে আপনার সঙ্গে কারো কারো যে আলাপ হয়েছে, সে খবর আমার জানা আছে।

তাঁর কথায় আমার মনে বেশ কৌতূহল জমে উঠলো। কারণ আলাপ যে হয়েছে সেকথা ঠিক। কিন্তু সেতো অতি সংগোপনে এবং সেটা গোপন রাখতে আমরা সবাই মৌখিকভাবে ছিলাম ওয়াদাবদ্ধ। মনের কৌতূহল চাপা রেখে ডাক্তারের চোখের দিকে তাকাই।

ডাক্তার আবারও হাসলেন।

হেসে হেসেই বললেন, দেখুন, আমি একজন ডাক্তার মানুষ। বহু রোগী আমার কাছে আসেন, আমিও অনেক মহলে যাই। কাজেই কখন কার সঙ্গে কি কথা হয়, আপনারা কি করে বুঝবেন? তবে হ্যাঁ, আমি আপনাদের সঙ্গে একমত। কারণ

সাম্প্রদায়িকতার মতো একটি সামাজিক বিষদাঁত জাতীয়তাবাদের সাঁড়াশি দিয়ে উপড়ে ফেলতে হবে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা চলে এবং তোলা উচিতও।

আপনি মনে হয় হেঁয়ালি করছেন ডাক্তার। তা না করে একটু খোলসা করুন আপনার বক্তব্য বিষয়টি।

জবাবে ডাক্তার বললেন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মধ্যে সামান্য কিছুও যদি সত্য থাকে, তবে আমার মতে, শেখ মুজিব এ দেশের বাস্তব অবস্থা এবং ঐতিহাসিক পরিস্থিতি সম্যক উপলব্ধি করেছেন। এর ফলে তাঁকে একজন প্রকৃত মার্কসবাদী বলে মনে করতে আমার কোনো দ্বিধা নেই। কারণ মার্কসবাদকে যাঁরা অপরিবর্তনশীল কিংবা অলংঘনীয় মনে করেন, সেইসব মার্কসবাদী আসলে রোমান ক্যাথলিক কিংবা ধর্মান্ধ মোল্লার মতোই প্রগতি-বিরোধী। বাঙালি জাতীয়তাবাদ একদিকে সাম্প্রদায়িকতা দূর করবে, অন্যদিকে ধ্বংস করবে পাকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ। ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, একচেটিয়া পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ, জঙ্গি সমরবাদ এবং প্রতিক্রিয়াশীল ও দুর্নীতিবাজ আমলাতন্ত্রবাদ সব মিলে দেশকে একটা জলাবদ্ধতায় পরিণত করেছে। এ ধরনের পরিস্থিতির পরিবর্তন চাই। চাই জীবনের গতিশীলতা। চাই প্রগতিমূলক পদক্ষেপ। জাতীয়তাবাদ বাঙালির মনে সৃষ্টি করবে অভূতপূর্ব আলোড়ন। জাতীয়তাবাদ তাকে চিন্তার জগতে প্রবাহিত করবে এমন একটি খাতে-যার গতিধারা সম্মুখেই চলবে, পেছন দিকে নয়। কোনো কোনো দেশের জাতীয়তাবাদ প্রতিক্রিয়ায় পর্যবসিত হয়েছে সত্যি, এমনকি ফ্যাসিবাদেও রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদ সঠিক নেতৃত্বে পরিচালিত হলে তার গতি হবে প্রগতির দিকে। আর সমাজ প্রগতির প্রতিটি পদক্ষেপই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। কাজেই শেখ মুজিবের ছয় দফা থেকে শুরু করে আগরতলা পর্যন্ত গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপে আমি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পরিপন্থী কিছু পাই না। এসম্পর্কে সেদিন কথা হচ্ছিলো ইত্তেফাকের মানিক মিয়ার সঙ্গে। দেখলাম, আমার সঙ্গে তিনিও একমত।

কথায় কথায় মানিক ভাইয়ের প্রসঙ্গ উঠে পড়ে।

ছয় দফাভিত্তিক জুন আন্দোলনে আওয়ামী লীগকে পর্যুদস্ত করার চক্রান্ত চলে। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হন। সেই সঙ্গে কারারুদ্ধ হন অসংখ্য কর্মী। কারারুদ্ধ হয়েছিলেন মানিক ভাইও।

মুক্তিলাভের পর মানিক ভাই সংগোপনে আত্মনিয়োগ করেন একটি ঐক্যজোট গঠন করার ব্যাপারে। এর আগে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন। মণি সিংহ ও খোকা রায় সেই ঐতিহাসিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এর আগে ন্যাপের পলাতক নেতাদের সঙ্গে গোপনে আমার মাধ্যমে মানিক ভাইয়ের দেখা-সাক্ষাৎ হয়। তিনি আলোচনা করতে চান বেআইনি ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মণি সিংহের সঙ্গে। পরে সে বৈঠকেরও আয়োজন করা হয়।

এমনিভাবে জাতির ঘোরতম দুর্দিনে মুক্তির উপায় সন্ধানে মানিক ভাই ব্যাকুল হয়ে পড়েন। প্রকাশ্যত, মানিক ভাই ও তাঁর পত্রিকার নীতি ছিলো কমিউনিজম-বিরোধী। কিন্তু উপরোক্ত গোপন বৈঠক ও আলাপ- আলোচনার মাধ্যমে উভয়পক্ষের মধ্যকার ভুল বোঝাবুঝি যেমন দূরীভূত হয়, তেমনি প্রতিষ্ঠা হতে থাকে সংগ্রামী মৈত্রী। সেই মৈত্রী ও সংগ্রামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানিক ভাই অগ্রসর হন বাঙালি জাতির কঠিনতম কাজ ঐক্যজোট প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। সেই মহান দেশপ্রেমিক দায়িত্ব পালনে যাঁরা তাকে আন্তরিকভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন তাঁদের মধ্যে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদিকা আমেনা বেগম, ন্যাপের পীর হাবিবুর রহমান ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের আবদুস সামাদের নাম অবশ্যই করতে হয়। নেপথ্যে মণি সিংহের নিষ্ঠাবান মার্কসবাদী ভূমিকা আর সম্মুখে মানিক ভাই—তাঁদেরই প্রেরণা ও প্রচেষ্টায় সেদিন দেশের সংগ্রামী আলোকবর্তিকা হাতে এগিয়ে আসে ত্রিদলীয় সংযুক্ত বিরোধী দল সংগ্রামের শপথ নিয়ে। আর তাঁদের সকলের পেছনে রইলেন ডাক্তার আলীম চৌধুরী তাঁর মার্কসবাদী প্রত্যয় নিয়ে।

এমনিভাবে ডাক্তার আলীম চৌধুরী নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ফেলেন দেশের রাজনৈতিক সমস্যা ও তার সমাধানের প্রশ্নে। আগেই বলেছি, চক্ষু বিশেষজ্ঞ ছাড়াও তাঁর আরেকটি গোপন পরিচয় ছিলো-রাজনীতি বিশেষজ্ঞ। শেখ মুজিবুর রহমান, মণি সিংহ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক ভাই—এঁদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোনো কোনো পর্যায়ে আলীম চৌধুরী ছিলেন গোপন সেতুবন্ধস্বরূপ।

আত্মশ্লাঘার সঙ্গে ডাক্তার আলীম দাবি করতেন, এ আমার মার্কসবাদী দায়িত্ব।

আমি কি একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ তিনি বলে বসলেন দেখুন, কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস শুধু যদি বস্তুর ব্যাখ্যা—বস্তুবাদ এবং সে বস্তুর দ্বন্দ্বমূলক চরিত্র—বস্তুর দ্বন্দ্ববাদ—এক কথায় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ রেখেই মরে যেতেন, তাতেই তাঁরা স্থান লাভ করতেন বিশ্বের প্রধানতম বৈজ্ঞানিকদের গৌরবময় আসনে। যে সাম্যবাদের দর্শন আজ তাঁদেরকে অমরত্ব দিয়েছে, একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমার কাছে তাঁদের বিজ্ঞান অর্থাৎ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ একই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও অভূতপূর্ব।

এই বলে ডাক্তার আমাকে তাঁর চোখ পরীক্ষার যন্ত্রপাতি নিয়ে চক্ষু নামের বস্তুর দ্বন্দ্বমূলক গঠন ও দ্বন্দ্বমূলক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া হাতে কলমে বোঝাতে লেগে গেলেন। ডান চোখ দিয়ে কেন বাম দিকে এবং বাম চোখ দিয়ে কেন ডান দিকে ভালো দেখা যায়, চোখের সেই মার্কসবাদী তত্ত্ব দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ মার্কস এঙ্গেলস-এর আগে আর কোনো বৈজ্ঞানিক প্রামাণিক তথ্যসহ আবিষ্কার করতে পারেননি। এমনিভাবে তিনি মানবদেহের

প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ, এমনকি তার রক্তকণিকা, শ্বাস-প্রশ্বাস, শ্রম ও বিশ্রামের দ্বন্দ্বমূলক অবস্থান ও বিপরীত ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়ে চললেন।

ঠিক এমনি সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। ফোনে কথা বলতে বলতে তাঁর মুখ মুহূর্তে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। রিসিভার ছেড়ে দিয়ে তিনি বললেন, রাওয়ালপিণ্ডির ছাত্রমিছিলে আয়ুব সরকার গুলিবর্ষণ করেছে। ইলিয়াস ভাই, অনেকদিন পর একটি সংগ্রামী শুভসংবাদ এসেছে। এবার যান, আপনারা যেভাবেই হোক ঐক্য মোর্চা গড়ে তুলে পাকিস্তানি স্বৈরাচার আর মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদ—এই দুই শত্রুকে একসঙ্গে কবর দিন।

সেটা ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসের কথা। ততোদিনে পিণ্ডি-পেশোয়ার আর লাহোর-করাচির আন্দোলন তীব্র থেকে হয়েছে তীব্রতর। আর বাংলাদেশে চলছে মরণপণ সংগ্রামের গোপন প্রস্তুতি। উপনিবেশবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পালিত ও পৃষ্ঠপোষিত স্বৈরতন্ত্রী আয়ুব-মোনেমের মৃত্যুঘন্টা তখন দেশজুড়ে বাজতে শুরু করেছে ঢং ঢং শব্দ করে।

জীবনে সাধারণ সংগ্রামে সাহসী

মোহাম্মদ আজিজ

কয়েকদিন আগেও ডাঃ আলীম চৌধুরীকে দেখেছি অসংখ্য রোগীর ভিড়ে তাঁর নিজস্ব চেম্বারে। রোগীদের প্রশ্ন করছেন। উত্তর লিখে নিচ্ছেন অতি ধৈর্য সহকারে একটার পর একটা। লেন্স চোখের সামনে ধরে বলছেন, 'দিলে ভাল হয়, না নিলে ভাল।' আবার কখনও কোনো গ্রামের সাদাসিধে লোককে হয়তো বলছেন, 'আপনার চোখে কি কি কষ্ট হয় আমাকে খুলে বলুন। কোনো সঙ্কোচ করবেন না।' রোগীদের এত যত্ন করে দেখা, এত সময় দেয়া আর কোথাও আমি দেখিনি। বাইরের ঘরে ভীষণ ভিড় দেখে মনে হতো, নিশ্চয়ই ডাক্তার সাহেব এখন খুব ব্যস্ত। কথা বলা যাবে না। ফিরেই যাই। তবু একটু আশা নিয়ে এক টুকরো কাগজে নাম লিখে ভেতরে পাঠাতাম। এক সেকেন্ড পরেই ডাক আসতো,'আসুন।' দেখতাম এত ভিড়েও তাঁর যেন কোনো ব্যস্ততা নেই। শান্তচিত্তে হাসিমুখে রোগীদের চোখ পরীক্ষা করছেন, প্রেসক্রিপসন দিচ্ছেন, আবার আমার কুশল' প্রশ্নও করছেন। অনেক সময় জিজ্ঞেস করেছি, একদিনে এত রোগী আপনার দেখতে হয়, একটু তাড়াতাড়ি হাত চালালেই তো পারেন। হেসে বলতেন, 'চোখের ব্যাপারতো, একটু মনোযোগ দিয়ে না দেখলে হয় না।'

তাঁর চেম্বারে আমি দেখেছি শ্রমিক, মজুর, জেলে, গেটের দারোয়ান, রিকশাচালক, ছাত্র, রাজনৈতিক নেতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা, কবি-সাহিত্যিক ইত্যাদি সর্বশ্রেণীর নাগরিককে। জিজ্ঞেস করেছি, মুটে, মজুর, দারোয়ান এরা যে আপনাকে চোখ দেখাতে আসে, এরা কি আপনার ১৬ টাকা ভিজিট দিতে পারে? সেই সুপরিচিত হাসিতে মুখখানা ভরে উঠেছে—বলেছেন, 'পাগল হয়েছেন! ওদের ভাতই জোটে না, তার ওপর আবার ১৬ টাকা ভিজিট। ওদের কাছ থেকে আমি টাকা নিই না। বরং ওষুধ কেনার মতো অবস্থা না থাকলে আমার কাছ থেকেই ওষুধ দিয়ে দিই।'

অসংখ্য দরিদ্র রোগীর চোখে ছোট-বড় অপারেশন করেছেন বিনা পারিশ্রমিকে। তাইতো তাঁর মৃত্যুতে কাঁদতে দেখেছি হাসপাতালের দারোয়ানকে। তাঁর অতিপ্রিয় ছাত্র ও ডাক্তার বন্ধুদেরকে, পাড়া-প্রতিবেশী মায় দোকান ও বস্তির লোকদের। এমনি একটি সাধারণ লোককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন কাঁদছো? সে বললো 'কাঁদবো না সাহেব? আমাদের চেরাগ যে নিভে গেলো। শত্রুরা সাহেবের বদলে আমাদের মতো তিনশ' মানুষকে মারতো কোনো দুঃখ হতো না। এমন মানুষতো আর পাবো না।'

মনে পড়ে ছোট একটি ঘটনা। তখন ডাক্তার আলীম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এসোসিয়েট প্রফেসর। হাসপাতালের গেটের একজন দারোয়ানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছেলে পায়ের স্যান্ডেল খুলে মেরেছিলো। ছেলেটি অসময়ে হাসপাতালে ঢুকতে চেয়েছিলো কোনো ভিজিটিং কার্ড ছাড়া। কর্তব্যপরায়ণ দারোয়ান তাতে বাধা দিয়েছিলো। এই অপরাধেই ছেলেটি তার চাইতে বয়সে অনেক বড় দারোয়ানকে মেরে বসেছে। গেটের ওখানে এই নিয়ে মহাগণ্ডগোল। একটু পরেই দেখা গেলো, আর কেউ নয়, গন্ডগোলের দিকে এগিয়ে আসছেন ডাক্তার আলীম চৌধুরী। সব দারোয়ান তখন ডাক্তার সাহেবকে ঘিরে ফেলেছে এবং বলছে, 'স্যার এর ন্যায্য বিচার চাই।'

তিনি সবকিছু শুনে বললেন, 'তোমরা যারা যারা এ ঘটনা দেখেছো, তারা আমার সাথে চলো। থানায় ডায়রি করা হবে।' একথা শুনে ছাত্রটির অভিভাবক আরও বেশি কেলেঙ্কারি হবে ভেবে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং ডাক্তার সাহেবের কাছে এসে অনুরোধ করলেন ব্যাপারটা নিয়ে আর বাড়াবাড়ি না করে তাঁর ছেলেকে ক্ষমা করে দিতে। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'ক্ষমা আমার কাছে নয়। ক্ষমা চাইতে হবে সেই দারোয়ানের কাছে। আপনার ছেলেকে নিয়ে আসুন।'

তারপর ডাক্তার সাহেবের বিধানমতো উচ্চশিক্ষিত ভদ্রসন্তানের ছেলে করজোড়ে ক্ষমা চাইলেন দারোয়ানের কাছে এবং অপমান করার অপরাধে জরিমানাও দিতে হলো বেশকিছু টাকা। দারোয়ান এবং আর সবাই অভূতপূর্ব এই দৃশ্যে হতবাক হয়ে গেলো। শুধু একটি নয়, এ রকম অসংখ্য ঘটনায় জনদরদি এই চিকিৎসক মহানুভবতার পরিচয় দিয়ে গেছেন।

সব কথা লেখা এখানে সম্ভব নয়। তবুও আরেকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। একবার চেম্বারে এক ভদ্রলোক কিছু কলা ও মিষ্টি নিয়ে এলো ডাক্তার সাহেবকে দেয়ার জন্য। তিনি দেখে ভীষণ রেগে গেলেন। বললেন, 'আপনি এক্ষুণি এগুলো নিয়ে আমার চেম্বার থেকে চলে যান। আগামীকাল সকালে হাসপাতালে দেখা করবেন। আপনার রোগীর চিকিৎসা আমি করবো না।' ভদ্রলোকটি অত্যন্ত বিব্রত হয়ে মাথা নিচু করে ক্ষমা চাইলেন। আমি জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে, ভদ্রলোকটির মা হাসপাতালে ডাক্তার সাহেবের ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছেন। চোখের ছানি অপারেশন

করতে হবে। ভদ্রলোক ভেবেছিলেন কিছু উপঢৌকন দিলে হয়তো ডাক্তার সাহেব তাঁর মায়ের চিকিৎসা ভালো করে করবেন; কিন্তু সে যে কত বড় ভুল হয়েছিলো, তার প্রমাণ পেতে বেশি দেরি হলো না।

এ জাতীয় দুর্নীতি আমাদের সমাজের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে বলে তিনি দুঃখ করতেন। ডাক্তাররাও যাতে এই দুর্নীতির প্রশ্রয় না দেন বা দেবার সুযোগ না পান সেজন্য তিনি ডাক্তারদের 'নন প্র্যাকটিসিং জব' করার জন্য প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলন করেছেন। এজন্যে তাঁকে অনেক সহকর্মীর বিরাগভাজনও হতে হয়েছে।

শিক্ষক হিসেবেও তিনি ছিলেন অনন্য। পড়াতে তিনি খুব ভালোবাসতেন। ছাত্রদের কাছে শুনেছি, একবার পড়াতে আরম্ভ করলে তাঁর সময়ের জ্ঞান থাকতো না। ৪৫ মিনিটের ক্লাস ৯০ মিনিটেও শেষ হতো না। ডাক্তার সাহেবের সাথে তাঁর ছাত্রদেরও ঘনিষ্ঠতা ছিলো খুব বেশি। সবসময়ই তিনি ছাত্রদের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন এবং তাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করেছেন। মেডিকেল কলেজের ছাত্ররাও কোনো সমস্যা দেখা দিলেই ছুটে যেত তাদের প্রিয় স্যারের কাছে। গণমুখী চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপায়ে দেশের সরকার ও জনসাধারণকে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

শুধু প্রখ্যাত চিকিৎসকই নন, ডাক্তার আলীম একজন বিশিষ্ট সমাজসেবীও ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ (প্রাক্তন পাকিস্তান) চিকিৎসক সমিতির যুগ্মসম্পাদক, কেন্দ্রীয় অপথালমোলোজিক্যাল সোসাইটি অব পাকিস্তানের সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ অন্ধ সমিতির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। এছাড়া আরও অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথেও যুক্ত থেকে নানাবিধ উপায়ে নিঃস্বার্থভাবে দেশের জন্য কাজ করে গেছেন।

১৯৭০ সালে প্রলয়ঙ্করি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পর ডাক্তার সাহেবকে দেখেছি আহার-নিদ্রা ভুলে গিয়ে অবিরাম পরিশ্রম করছেন। সাবেক পাকিস্তান চিকিৎসক সমিতির পক্ষ থেকে নিজে বাজারে গিয়ে কিনেছেন ওষুধপত্র, কম্বল, শাড়ি, লুঙ্গি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস।

অত্যন্ত কর্মনিষ্ঠ এই মানুষটির ভেতরে ছিলো একটা সাহিত্যিক মনও। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, বিদ্রোহী কবি নজরুল ও নবযুগের বিপ্লবী সুকান্ত ভট্টাচার্য-এঁরা ছিলেন তাঁর অত্যন্ত প্রিয় কবি। কোনো রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসরে আমন্ত্রিত হলে সমস্ত কাজ ফেলে ছুটে যেতেন সপরিবারে। নিজেও কিছু কিছু কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছেন। মাঝে মাঝে তিনি আক্ষেপ করে বলতেন, 'ডাক্তার না হয়ে আমার সাহিত্যিক হওয়াই উচিত ছিলো। সাহিত্য আমার ভীষণ ভালো লাগে।'

ছাত্রজীবনে তিনি "দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'দৈনিক মিল্লাত'- এর সাব-এডিটর ছিলেন। এরপর তিনি 'যাত্রিক' নামে একটি প্রগতিশীল মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা

করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকার পাতায় ডাক্তার আলীমের একাধিক প্রবন্ধ পড়বারও স্মৃতি অম্লান। তিনি সুন্দর কবিতাও আবৃত্তি করতে পারতেন। নিজস্ব টেপরেকর্ডে এখনও তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধ টেপ করা আছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, সদালাপী অমায়িক এই মানুষটির আড়ালে ছিলো এক সংগ্রামী মন।

বিপ্লবী নজরুলের আদর্শে অনুপ্রাণিত মানবতাবাদী ডাক্তার আলীম আমাদের ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থার বিরোধিতা করে গেছেন আজীবন। সমাজের সমস্ত শোষণ, বঞ্চনা, অন্যায় ও অত্যাচারের জন্য যারা দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে তিনি জ্বলন্ত ক্রোধ ও ঘৃণায় ফেটে পড়তেন। যাকেই অন্যায় করতে দেখেছেন তার বিরুদ্ধেই তিনি সোচ্চার হয়ে কথা বলেছেন। এজন্যে অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীনও হতে হয়েছে। কিন্তু তাতে তিনি কখনও দমে যাননি। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি নীতিচ্যুত ব্যক্তিদের সমালোচনা করেছেন সবার সামনেই।

ছাত্রজীবনে ডাক্তার আলীম '৫২-র ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। ছাত্রজীবনে এমন কোনো গণআন্দোলন ছিলো না, যেখানে ছিলো না আলীম চৌধুরীর উপস্থিতি। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিলো অসীম। পাকিস্তানের সেই সময়কার প্রতিক্রিয়াশীল কুচক্রী সরকারের বিরোধিতা করার ফলেই ১৯৫৮ সালে তাঁকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয় লন্ডনে। সুদূর প্রবাসে পড়াশোনার কঠোর পরিশ্রমের মধ্যেও ব্যস্ত থেকেছেন দেশের কাজ নিয়ে। ১৯৬২ সালে লন্ডনে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার পেছনে আলীম চৌধুরীর দান অপরিসীম। তিনি ছিলেন এর অন্যতম আহ্বায়ক ও প্রথম সম্পাদক। এখনও তাঁর আলমারিতে সাজানো আছে সেখানকার বাংলা একাডেমির ফাইলপত্র। ওতে দেখেছি তাঁর নিজ হাতে লেখা একাডেমির সংবিধান এবং বিভিন্ন সভা আহ্বান করা সংক্রান্ত অসংখ্য চিঠি। লন্ডনের প্রবাসী জীবনে একবার ২১ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে তিনি যে সুন্দর অভিভাষণ দিয়েছিলেন, তাতেও দেখলাম উল্লেখ আছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের স্বৈরাচার এবং ঔপনিবেশিক শোষণের নির্মমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার আহ্বান।

অত্যন্ত নিরহঙ্কারী ডাক্তার আলীমের ভেতরে ছিলো বহুমুখী প্রতিভার প্রদীপ্ত স্বাক্ষর। বাংলা ও ইংরেজি দুভাষাতেই তিনি চমৎকার লিখতে ও বলতে পারতেন। সর্বস্তরের মানুষের সাথে তিনি সমানভাবে মিশতেন অকপটে। খেটে-খাওয়া মানুষের সাথে একাত্মতাবোধ হওয়া ছিলো তাঁর চরিত্রের এক অনন্যসাধারণ গুণ। বাংলার এই অমূল্যপ্রাণ মানুষটি স্বাধীনতার বেদীমূলে জীবন বিসর্জন দিয়ে হয়েছেন লোকোত্তর, কালজয়ী।

আমাদের স্মৃতির মণিকোঠায় তিনি উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন চিরকাল। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হোক নতুন প্রজন্মের স্বাধীন নাগরিক।

সমাজ ও সাহিত্য

ডাঃ আলীম চৌধুরী

স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে আমাদের মন আনন্দে নেচে উঠেছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায়। সেদিন আমরা কল্পনার নেত্রে দেখেছিলাম এক নতুন দেশ. যেখানে গড়ে উঠবে নতুন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য। সাম্রাজ্যবাদী শোষণে জর্জ্জরিত জনগণ সেদিন নতুন নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনায় উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ভাবেই তারা আশা করেছিল, পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ নিপীড়িত মানুষের বাণী যা রাজরোষের ভয়ে এতকাল ছিল অকথিত তা মূর্ত্ত হয়ে উঠবে স্বাধীন দেশের সাহিত্যের প্রতি ছত্রে ছত্রে। আজাদী লাভের পর সুদীর্ঘ কয়েকটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তারা অবাক বিস্ময়ে দেখলো যে তাদের প্রাণের বাণী অকথিতই রয়ে গেলো। ভাষাহীন জনগণের হয়ে কথা কইলেন না আমাদের সাহিত্যিকরা। জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত এই সব সর্ব্বহারা সাহিত্যেও হয়ে রইলো উপেক্ষিত। সমাজ জীবনে যে পরিবর্ত্তনের ঢেউ এসে লেগেছে তার ছোঁয়াচ এসে লাগলো না সাহিত্যে। জাতির যারা মেরুদণ্ড তাদের বাদ দিয়ে সাহিত্য হয়ে রইলো মেরুদণ্ডহীন। তাই আমাদের সাহিত্য আজ বিরাট সঙ্কটের সম্মুখীন। এই যে সঙ্কট তা আজ প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই ভাবিয়ে তুলেছে–তারা আজ ভাবতে শুরু করেছেন–সাহিত্য ক্ষেত্রে সমস্যা কি এবং কিইবা এর সমাধান?

আমাদের বর্তমান সাহিত্য বিভিন্নমুখী। সাহিত্যিকরা বল্গাবিহীন ঘোড়ার মত যে যার দিকে ছুটে চলেছেন। এরই জন্য এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসর সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির কোন আভাসই পাওয়া যাচ্ছে না। এই দুরবস্থার মূলে রয়েছে বলিষ্ঠ আদর্শের অভাব। সাহিত্যসৃষ্টির কাজে হাত দেওয়ার আগে সর্ব্বাগ্রে জানা প্রয়োজন জীবনের গতি কোন্ দিকে কারণ জীবনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে সাহিত্য। সেই সঙ্গে জানা দরকার সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি? কারণ উদ্দেশ্য বিহীন সাহিত্য হালবিহীন তরণীর মতো। এখানে সাহিত্য যদি হয় তরণী, কাণ্ডারী তার সাহিত্যিক আর হাল হলো উদ্দেশ্য বা আদর্শ। কাণ্ডারী যতো পাকাই হোন না কেন হাল না থাকলে কোন দিনই তার তরী লক্ষ্য স্থলে পৌছাবে না তেমনি যে সাহিত্যিকের কোন বলিষ্ঠ আদর্শ বা মতবাদ নেই

তার রচিত সাহিত্য কোন দিনই সার্থকতা লাভ করতে পারবে না। নিজের বক্তব্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রত্যেক লেখকের পক্ষে আবশ্যক। মোট কথা সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে লেখকের একটা বলিষ্ঠ আদর্শবাদ থাকা চাই। আদর্শের মাপ কাঠিতেই বিচার হবে আজকের সাহিত্যের মান। কিন্তু প্রশ্ন জাগে কিভাবে নির্দ্ধারিত হবে সেই আদর্শ? আদর্শ দূরদৃষ্টির উপর নির্ভর করে। সামাজিক উপলব্ধি থেকেই আসবে সেই দূরদৃষ্টি। সমাজকে, নিজেকে আজ যাচাই করে দেখতে হবে। সমাজের এই দুর্দ্দশার কারণ কি? এই দুর্দ্দশার জন্য দায়ী কারা? কিইবা এর প্রতিকার? কি হওয়া উচিত বর্তমান সমাজের গতিপথ ও ভবিষ্যত সমাজের রূপ। লেখকের জিজ্ঞাসু মন একটার পর একটা প্রশ্ন করবে নিজেকে আর তার উত্তর খুঁজে নেবে ইতিহাসের শিক্ষা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে। এসব প্রশ্নের সদুত্তরগুলোই হবে তার আদর্শ নির্ণয়ের সহায়ক। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টির সমন্বয়েই সৃষ্ট হবে নতুন আদর্শ। গতানুগতিকতার মোহমুক্ত সাহিত্যিকরা এগিয়ে যাবেন সেই আদর্শকে সাহিত্যে রূপায়িত করে নতুন সমাজের গোড়াপত্তন করতে।

সমাজ সচেতনতাই সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের উত্থান-পতনের সঙ্গে নিজের জীবনের উন্নতি অবনতি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। তাই সমাজকে উপেক্ষা করে কল্পনায় বিভোর থাকা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

সমাজ জীবনের সার্থক প্রতিফলনই সাহিত্য। কঠোর ও নিরস বাস্তবকে কল্পনার রং চড়িয়ে সরস ও সুন্দর করে তোলাই সাহিত্যিকের কাজ। সাহিত্যিকের স্থান কল্পনার নীল নভোমণ্ডলে নয় বাস্তব পৃথিবীর ধূলি মাটির মধ্যে। সমাজ থেকেই সংগ্রহ করতে হবে সাহিত্যের উপকরণ। সাহিত্য হবে জীবন- কেন্দ্রিক। জীবনের বিচিত্ররূপ অমর হয়ে ধরা দেবে লেখকের কাছে।

সমাজসচেতন সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে বর্তমান সমাজ সম্বন্ধে একটি সম্যক ধারণা থাকা উচিত। চারিদিকে আজ চলেছে স্বার্থের দ্বন্দ্ব। অশিক্ষা, অন্নাভাব, দূর্নীতি, ব্যভিচার প্রভৃতি সমাজ জীবনকে আজ পঙ্গু করে দিয়েছে। শিল্পী-সুলভ চাতুর্য্যের সঙ্গে এগুলো আজ তুলে ধরতে হবে পাঠকের সামনে।

কিন্তু সমস্ত বর্ণনার মধ্যে থাকা চাই ইঙ্গিত মুখরতা। শুধু সমস্যাগুলো চোখের সামনে তুলে ধরলে চলবে কেন? সমাধানের পথও বাৎলে দিতে হবে। সমাজের অন্ধকার দিকটার প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করে কোন লাভ নেই যদি না আলোকের সন্ধান দেওয়া যায়। কারণ আলো এবং আঁধার পাশাপাশি থাকলেই শুধু তফাৎটা চোখে পড়ে। সমাজের দুরবস্থার ছবি আঁকবার কাজে হাত দেওয়ার আগেই ভেবে দেখতে হবে বর্তমান সমাজব্যবস্থার গলদ কোথায়? কিভাবে দূর করা যেতে পারে সেই সব গলদ? কি ধরণের সমাজ ব্যবস্থা আমাদের কাম্য? সমস্যা সমূহের সাথে সমাধান সম্বন্ধেও পরিষ্কার ইঙ্গিত থাকা চাই লেখার মধ্যে। তা নইলে হতাশায় হাহুতাশ করে কোন লাভই

হবে না। জীবন যুদ্ধে বিপর্য্যস্ত জনগণকে আজ শোনাতে হবে আশার বাণী। দিশেহারা মানুষকে আজ দিতে হবে পথের সন্ধান, দেখাতে হবে মুক্তির আলো। হতচেতন জাতিকে আজ দিতে হবে বৈপ্লবিক চেতনা।

আমাদের দুঃখ-দুর্দশার জন্য দায়ী বর্তমান পুরানো ঘুণে-ধরা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক বৈষম্যই রয়েছে সবকিছুর মূলে। এর একমাত্র প্রতিকার পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন এই সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করাই হবে সাহিত্যিকদের প্রধান কর্তব্য। সর্বহারাদের মনে যে অব্যক্ত বিক্ষোভ সঞ্চিত হয়ে আছে তা প্রকাশ পাবে সাহিত্যিকের লেখনীর মাধ্যমে। সেই বিক্ষোভই একদিন রূপ নেবে বিপ্লবের।

সাহিত্যিকরা জাতির পথ প্রদর্শক। তাদের অমর লেখনী চিরকাল মানুষকে দিয়ে এসেছে সব রকম অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার দুর্জয় সাহস, আদর্শের জন্য আত্মোৎসর্গ করে মৃত্যুঞ্জয়ী হবার প্রেরণা। প্রাক্ বিপ্লব যুগের রুশ এবং ফরাসি সাহিত্যই এর প্রমাণ। রাশিয়াতে টলস্টয় ও গোর্কী এবং ফ্রান্সে রুশো ও ভল্টেয়ার যদি তখন নিপীড়িত জনগণের দুঃখ-দুর্দশা সবার চোখের সামনে তুলে না ধরতেন তাহলে কোন কালেই হয়তো সেখানে বিপ্লব সম্ভবপর হতো না। বিপ্লবের ক্ষেত্র রচনায় সাহিত্যই প্রধান হাতিয়ার।

সমাজ এবং সাহিত্য পরস্পর নির্ভরশীল। সমাজের বর্তমান পরিবেশকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে তৎকালীন সাহিত্য। অথচ সেই সাহিত্যের নির্দেশিত পথেই সৃষ্ট হয় নতুন সমাজ। সমাজের পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল হওয়া উচিত। কারণ রাজনীতি, অর্থনীতিই সমাজের রূপ নিয়ন্ত্রণ করে। জারের রাশিয়ার সঙ্গে আজকের রাশিয়ার পার্থক্যটা কোথায়? পার্থক্যটার মূলে রয়েছে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা। সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য।

সমাজ পরিবর্তনশীল। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজও রূপ বদলে চলেছে। আজকের স্বীকৃত রাজনৈতিক মতবাদই নির্দ্ধারণ করবে ভবিষ্যত সমাজের রূপ। আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে তাকে ভিত্তি করেই গঠিত হবে আমাদের নতুন সমাজ ব্যবস্থা।

যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে তাকে এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ জীবনকে অস্বীকার করা। রাজনৈতিক আদর্শ নিরপেক্ষ সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা মানসিক দৈন্যেরই পরিচায়ক। জীবনকে বাদ দিলে সাহিত্যের মূল্য শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়ায়। কারণ জীবনকে যা ফুটিয়ে তোলে, মানুষের সত্তাকে যা প্রসারিত করে তাইতো সাহিত্য।

একদল লোক বলে থাকেন যে, শিল্পী হিসেবে সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই সাহিত্যিকের একমাত্র কাজ। রাজনৈতিক আদর্শের প্রতিফলন সৌন্দর্য্য সৃষ্টির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ

এবং সাহিত্যিক মর্যাদা হানিকর। কিন্তু তারা ভুলে যান যে সাহিত্যিক একাধারে শিল্পী এবং মানুষ। শিল্পী হিসেবে যেমন তার দায়িত্ব রয়েছে সৌন্দর্য্য সৃষ্টির, তেমনি মানুষ হিসেবে তার কর্তব্য মনুষ্যত্বের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করা।

বিরুদ্ধবাদীরা বলবেন—সাহিত্যকে রাজনীতির সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখলে সাহিত্য হয়ে দাঁড়াবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচার পত্র। কিন্তু সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি প্রচার নয়? লেখকের চিন্তাধারার সঙ্গে পাঠক পরিচিত হোক, তার মতবাদ পাঠক গ্রহণ করুক, ইহাই প্রত্যেক লেখকের অন্তরের কামনা। কোন রাজনৈতিক দল যদি গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধের মারফত তাদের রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করতে পারেন তবে তাও সাহিত্য বলেই বিবেচিত হবে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যদিও প্রচার কিন্তু প্রচার মাত্রই সাহিত্য নয়। তা হলে সরকারী বুলেটিন, পার্টি মেনিফেস্টো থেকে নিয়ে মায় রেডিও প্রোগ্রাম পর্যন্ত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতো কারণ এসবের উদ্দেশ্যও প্রচার। শুধু ঘটনার নিখুঁত বিবরণ দিলেই চলবে না, বর্ণনার মধ্যে থাকা চাই শিল্পী সুলভ চাতুর্য্য। জীবনের বিভিন্ন দিককে সংবেদনশীল মন নিয়ে রূপ-রসে চিত্রিত করে এমন ভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে হবে যা পাঠকের মনকে সহজেই আকৃষ্ট করবে।

অনেকে সাহিত্য ক্ষেত্রে উদারতার দোহাই দিয়ে বলে থাকেন– ব্যক্তি বিশেষের তার স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী জীবনকে যে কোন ভাবে চিত্রিত করার স্বাধীনতা আছে। সাহিত্য ক্ষেত্রে সত্যিকারের উদারতা সমর্থনযোগ্য। সাহিত্যিকের স্বাধীন চিন্তাধারায় হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। কিন্তু যখন স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার চলতে থাকে তখন হস্তক্ষেপ হয়ে পড়ে অত্যাবশ্যক।

কারণ অন্যায়কে মেনে নেওয়া উদারতা নয়, দুর্বলতা। সমাজের কতটুকু উপকারে লাগলো তা দিয়েই বিচার হবে সাহিত্যের মূল্য। আজ যদি দেখা যায় কোন সাহিত্যিকের রচনা সমাজের অনিষ্ট করে চলেছে তবে তাকে রুখে দাঁড়াতে হবে। তাদের এ ধরনের অপচেষ্টাকে প্রতিরোধ করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকেরই রয়েছে। ব্যক্তি বা দল বিশেষের খেয়াল-খুশীর জন্য সমাজকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া যায় না।

সমাজ সচেতন সাহিত্য সৃষ্টির অর্থ এই নয় যে সাহিত্য রাজনীতির 'সঙ্কীর্ণ' গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে যাবে। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অভিযোগের প্রতিধ্বনি করাই সাহিত্যের একমাত্র কাজ নয়, হতে পারে না। এসব তো মানুষের জীবনের একদিক মাত্র। বাস্তব সাহিত্য সৃষ্টির অর্থ— প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা প্রভৃতি মানব মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে বিসর্জন দেওয়া নয়।

মানুষের জীবনে এগুলির মূল্যও কম নয়। জীবন-কেন্দ্রিক সাহিত্যে এসবের জন্যও যথার্থ স্থান রয়েছে। তাছাড়া সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার, ধর্মীয় রীতি-নীতিও সাহিত্যে স্থান পেতে পারে কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে তা যেন কোন ক্রমেই গণ-স্বার্থের পরিপন্থী না হয়। গণ-স্বার্থের পরিপন্থী রচনা সাহিত্য নয়, সাহিত্যের জঞ্জাল। যত শীঘ্র সম্ভব এর মূলোৎপাটন করা যায় ততই সমাজের মঙ্গল।

সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির অপর একটি গুণ সার্বজনীনতা। ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের চিন্তাধারাকে এমনভাবে সার্বজনীন রূপ দিতে হবে যাতে জাতি, বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে

প্রত্যেক মানুষের পক্ষে তা গ্রহণযোগ্য হয়। আমরা যদি আজ সত্যিকারের উদার মনোভাব নিয়ে সাহিত্য সেবায় ব্রতী হই তাহলে জাতির বৃহত্তর কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

আমাদের চিন্তাধারায় নতুন ভাবধারা সঞ্চার করতে হবে। অন্ধ বিশ্বাসের বশে কোন কিছু মেনে না দিয়ে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে হবে তার সত্যতা। অদৃশ্য ললাট-লিখন বলে কোন কিছু নেই। মানুষ নিজেই তার অদৃষ্টের রচয়িতা। মানুষের দুঃখ দুর্দশার জন্য অদৃষ্ট দায়ী নয়, এসব কায়েমী স্বার্থবাদীদের চক্রান্ত ও নিজেদের নিক্রিয়তার ফল। সক্রিয় চেষ্টার দ্বারা নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন সাধন করা যেতে পারে—এ কথাটা জনগণকে বুঝিয়ে দিতে হবে। দৃঢ় যুক্তিবোধ স্থান নেবে কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের।

সাহিত্যিকরা জনগণের স্বার্থক প্রতিনিধি। নির্বাচিত না হলেও, নির্যাতিতের জন্য গভীর মানবতা বোধ তাদের দিয়েছে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার। তাদের মতামত জনগণের অন্তরের অকথিত বাণীর প্রতিধ্বনি। সাহিত্যিকদের অন্তদৃষ্টির সামনে ধরা পড়ে সেই বাণী। সাহিত্য ক্ষেত্রের পার্লামেন্টে এসব প্রতিনিধিরাই জনগণের বক্তব্য পেশ করবেন, তাদের হয়ে লড়বেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে লাঞ্ছিত, অপমানিত সর্বহারাদের তাঁরাই হবেন সার্থক বার্তাবহ। যত শীঘ্র তাঁরা আজ এ কাজে প্রবৃত্ত হন নিপীড়িত মানবাত্মার মুক্তি সংগ্রাম ততই ত্বরান্বিত হবে।

জনগণকে সাহিত্যিকরা দেবেন রাজনৈতিক চেতনা। নেতারা সেই চেতনাকে কাজে লাগাবেন বিপ্লবের ক্ষেত্র রচনায়। যে শ্রেণী সংগ্রাম আজ উৎকট হয়ে উঠেছে আমাদের সমাজে তার সার্থক রূপায়ণ হবে আজকের সাহিত্যের প্রধান উপাদান। শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়বার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে হবে জনগণকে কারণ জনতার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব সাহিত্যিকদেরই। কিংকর্তব্যবিমূঢ় শোষিত জনগণকে সমাজের গতিপথ নির্দেশ করবেন সাহিত্যিকরা, তাদের নির্দেশিত পথেই শুরু হবে সর্বহারাদের বিজয় অভিযান। আসন্ন সংগ্রামে জনতার পাশে এসে দাঁড়াতে হবে সাহিত্যিকদেরও। যত বাঁধা বিপত্তিই আসুক না কেন সংগ্রাম মুখর বিঘ্ন সঙ্কুল সেই পথই তাদের বেছে নিতে হবে। গভীর মানবতাবোধ, আপোষহীন মনোভাব ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সাথে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হলে জয় তাদের অনিবার্য্য। সংঘাত এবং বিরোধের মধ্য দিয়েই সার্থকতা লাভ করবে আমাদের নতুন সাহিত্য।

আজ বিশ্বব্যাপী নির্যাতিতের যে মুক্তি অভিযান শুরু হয়েছে আমরা নিজেদের তা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারি না। পৃথিবীর অন্যান্য অগ্রগামী দেশের সাথে সমান তালে পা ফেলে আমাদেরও এগিয়ে যেতে হবে। সমাজ ব্যবস্থার আজ যে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে তাকে ত্বরান্বিত করার দায়িত্ব সাহিত্যিকদেরই। তা নইলে দু'শো বছরের পরাধীনতার ফলে পশ্চাৎপদ জাতি আরও পেছনে পড়ে যাবে। সমাজ জীবনে আমরা যত শীঘ্র সম্ভব সেই ঈপ্সিত পরিবর্তন আনতে পারি, জাতির জন্য তা ততই মঙ্গলজনক।

স্বীয় আদর্শলাভের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাবার পথ সুগম করে দিতে হবে। এর জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন জনগণের অধিকারবোধকে জাগ্রত করা। এছাড়া জনগণ নতুন সমাজ সৃষ্টির তাগিদ কোনদিন উপলব্ধি করতে পারবে না।

সাহিত্যিকরা সমাজ ক্ষেত্রে আজ যে বীজ রোপণ করবেন কাল তা এমন এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হবে যার সুশীতল ছায়া শান্তি দেবে কোটি কোটি আর্তমানবাত্মাকে। সাহিত্যিকদের নির্দেশিত পথেই চলবে জনতার মিছিল, নতুন জগতের সন্ধানে।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে চতুর্থ বর্ষের ছাত্রাবস্থায় ডাঃ আলীমের এ লেখাটি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত। রচনাকাল ১৯৫২।

রবীন্দ্র–নজরুল প্রসঙ্গে

আবদুল আলীম চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যাকাশের দুই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী। তিনি একাধারে ছিলেন কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, শিল্পী, সুর স্রষ্টা ও দার্শনিক। তিনি নিজে একজন গায়ক ও অভিনেতাও ছিলেন। তাঁর উপন্যাসগুলো তৎকালীন সমাজের এক অপূর্ব আলেখ্য। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে তাকে বাংলার মোপাঁসা বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। তিনি প্রায় আড়াই হাজার গান লিখেছেন এবং সমসংখ্যক ছবিও এঁকেছেন। তাছাড়া বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি ইত্যাদি বহু বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বিশ্ব পরিচয় নামে একখানা বিজ্ঞানের বইও রচনা করেছিলেন তিনি।

দার্শনিক হিসেবে চিন্তার জগতেও তার দান অসামান্য। এতো গেলো চিন্তার জগতের কথা। বাস্তব কর্মক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের অবদান কম নয়।

পাবনা, কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানে তিনি তার জমিদারীতে সমবায় সমিতি করেছেন, কৃষি ব্যাংক করেছেন। কৃষি ও কৃষকের উন্নতির জন্য সক্রিয়ভাবে প্রচেষ্টা করেছেন, পাঠশালা-হাসপাতাল করেছেন, পুকুর কাটিয়েছেন। গাছ লাগিয়েছেন। পরিবেশ সচেতনতা ও চিন্তা ধারায় রবীন্দ্র নজরুলের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত-পালিত তাই তিনি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সত্য ও সুন্দরের উপাসনা করে যেতে পেরেছেন। অন্য দিকে দারিদ্র্যের নিপীড়নে বারবার ব্যাহত হয়েছে নজরুলের শিল্প-সাধনা।

নজরুল নিজে দরিদ্র এবং বাস করতেন দরিদ্রদেরই মাঝে। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে দরিদ্রদের মাঝে নেমে আসা সম্ভব ছিল না। এই অক্ষমতা কবি নিজে বিনয়ের সঙ্গে স্বীকার করেছেন ঃ

"ধনে মানে যেথায় আছে ভরি
সেথায় তোমার সঙ্গ আশা করি,
সঙ্গী হয়ে আছ যেথায় সঙ্গীহীনের ঘরে

সেথায় আমার হৃদয় নামে না যে
সবার পিছে সবার নিচে, সর্বহারাদের মাঝে।"

এবার আমি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের কাব্যের একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা করবো। এদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা স্বকীয়তা হৃদয়ঙ্গম করতে হলে এ ধরনের আলোচনা প্রয়োজন।

মূলতঃ এরা দু'জনেই মানুষের কবি। মানুষের সুখ-দুঃখ নিজস্ব রস ও কল্পনায় চিত্রিত করেছেন তাঁদের কাব্যে। এঁরা উভয়েই ছিলেন সাম্প্রাদায়িক মিলনের অগ্রদূত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মিলনের হস্ত প্রসারিত করে হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টানকে এক হয়ে যাবার আহ্বান জানিয়েছেন। নজরুলও কামনা করেছেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মৈত্রী। কিন্তু সেখানেই থামেন নি তিনি, সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাবধান করে দিয়েছেন বিভেদ সৃষ্টিকারীদের ভূমিকা সম্পর্কে।

"ধর্ম জাতির নাম লয়ে এরা বিষাক্ত করে দেশ
এরা বিষাক্ত সাপ, ইহাদের মেরে কর সব শেষ।"

এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর তফাৎ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দু'জনেই তাদের লেখনীকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু নজরুল যেখানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে করেছেন বিদ্রোহ সেখানে রবীন্দ্রনাথ মানুষের শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন করেছেন।

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।"

একই কথার স্বীকৃতি দেখি ঐকতান কবিতায়। এই কবিতায় তিনি যে বিনয় দেখিয়েছেন তা অন্য কোন কবির কাব্যে দেখা যায় না। বিশ্বকবি সারা বিশ্বের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনাকে শতধারায় তাঁর কাব্যে প্রকাশ করেও তৃপ্ত হতে পারেননি। শেষ জীবনে তাঁর মনে হয়েছে যে খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনের অংশীদার তিনি হতে পারেননি, অখ্যাত মানুষের মর্ম বেদনা পুরোপুরি বোধ হয় তিনি তাঁর কাব্যে প্রকাশ করতে পারেন নি, তাই তিনি নব যুগের অখ্যাতজনের কবিকে আহ্বান জানিয়েছেন।

"কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির লাগি কান পেতে আছি।"

"এসো কবি, অখ্যাতজনের
নির্বাক মনের।
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার।"

"মূক যারা দুঃখে-সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সন্মুখে।
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা, তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন
আপনারি খ্যাতি—
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।"

সেই অখ্যাত জনের কবি হলেন নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। এঁদের কাব্য সাধনায় তাই আমরা দেখি একটা মৌলিক পার্থক্য। চাঁদের দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেখানে বাঁধ ভাঙ্গা হাসির সন্ধান পেয়েছেন সেখানে ক্ষুধার্ত নজরুলের মনে হয়েছে—

"চাঁদ নয় ও যেন কমলা লেবুর কোয়া তৃষিতের তরে
একটি নিমেষ, তবুও রসনা উঠিবে এ রসে ভরে"

একই ভাবের অভিব্যক্তি আরও প্রকট হয়ে ওঠেছে সুকান্তের কবিতায়।

"ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।"

রবীন্দ্রনাথ মুনী ঋষির মত শান্ত সমাহিত। ভগবানে ছিল তার অটল বিশ্বাস। নজরুল বিপ্লবী সৈনিক। মনঃপুত না হলে বিধির বিধানকেও চ্যালেঞ্জ করতে কসুর করেন নি। এই তফাৎটা তাদের কাব্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। সামাজিক অবিচারে দু'জনেই ব্যথিত হয়েছেন কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া হয়েছে ভিন্ন রকমের।

রবীন্দ্রনাথ কাতরভাবে বলেছেন—

"কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশী সঙ্গীতহারা"

সেখানে সৈনিক নজরুল গর্জে উঠেছেন—

'বীণা মোর শাপে তব হল তরবার।'

নজরুলের বাঁশীও সঙ্গীত হারিয়েছে কিন্তু স্তব্ধ হয়নি খুঁজে পেয়েছে নতুন সুর আর সেটা হল সংগ্রামের। রবীন্দ্রনাথ, ঋষিতুল্য, পৃথিবীকে দেখেছেন ক্ষমা-সুন্দর চোখে। তিনি মনে মনে অত্যাচারী-পাপীদের সম্পর্কে ভগবানের কাছে প্রশ্ন করেছেন—

"যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি তাদের বেসেছ ভালো।"

কিন্তু নজরুল সেখানে ক্ষমাহীন কণ্ঠে শোষকদের ধ্বংস কামনা করেছেন—

"যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটী মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্ত- লেখায় তাদের সর্বনাশ।"

অন্যায়ের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ যেখানে করেছেন প্রতিবাদ সেখানে নজরুল করেছেন বিদ্রোহ। আর এটাই নজরুল কাব্যের বৈশিষ্ট্য। আজ আমরা এখানে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপন করার জন্য সমবেত হয়েছি। এ ধরনের অনুষ্ঠান অর্থহীন যদি না আমরা তাদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি ও তাদের আদর্শকে নিজেদের জীবনে রূপায়িত করতে পারি।

আমরা আমাদের চারপাশে আজও দেখতে পাচ্ছি অন্যায়, অত্যাচার, বৈষম্য, সংস্কার ও গোঁড়ামী। আজও মানুষ মানুষকে লাথি দেয়, মারতে উদ্যত হয়। আজও শোনা যায় আর্তের ক্রন্দন। পৃথিবীজোড়া চলে সর্বাত্মক ধ্বংসের আয়োজন। আজ যদি এই সব অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমরা অকুতোভয়ে প্রতিবাদ করতে পারি, মানুষের মুক্তি সাম্য ও শান্তির জন্য কাজ করতে পারি তাহলেই রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

বাংলার এই দুই মহাপুরুষকে শ্রদ্ধার সঙ্গে আজ আমরা স্মরণ করছি আর কামনা করি আমরা যেন আমাদের চিন্তায় ও কর্মে তাদের আদর্শকে বাস্তব রূপ দিতে পারি।

প্রেমিকের প্রেম আর ব্যথিতের ব্যথা একই সুষমায় মণ্ডিত হয়ে স্থান পেয়েছে তাঁর কাব্যে।

ভারত-সম্রাট সাজাহানের প্রেমের অভিব্যক্তি কবি চিত্তকে বিমোহিত করেছিল। স্থূল দৃষ্টিতে তাজমহলকে মর্মরে গাঁথা প্রাসাদ বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু কবি-চিত্তে তাজমহলকে মনে হয়েছে শোকার্ত প্রেমিকের এক বিন্দু নয়নের জল। প্রাণহীন পাথরও যেন কথা বলে উঠেছে। শুনতে পেয়েছেন তিনি এক শাশ্বত ও চিরন্তন প্রেমের বাণী—

"যুগে যুগান্তরে
কহিতেছে এক স্বরে
চির বিরহীর বাণী নিয়া
ভুলি নাই ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

রবীন্দ্রনাথ শুধু ভারত-সম্রাটকে নিয়ে কবিতা লেখেন নি। তার কবিতা থেকে সাধারণ মানুষও বাদ যায়নি। অন্তঃপুরের যে সাধারণ মেয়েটি ব্যথায় গুমরে মরছে সেও স্থান পেয়েছে তাঁর কাব্যে। তেমনি স্থান পেয়েছে অগণিত খেটে-খাওয়া মানুষ যারা হাটে-মাঠে-ঘাটে কাজ করে যাচ্ছে—

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।

আমাদের সমাজে এই সব মানুষ সম্মানের এবং মর্যাদার আসন লাভ করতে পারেনি কোনদিন। মানুষের মৌলিক অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত। মানবতার এই অপমানে ব্যথিত কবি-হৃদয় তাই কেঁদে উঠল। ভর্ৎষনার সুরে দেশবাসীকে বললেন তিনি—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান
অপমান হতে হবে তাদের সবার সমান
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছে যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আমাদের দেশের অনগ্রসরতার কারণ। সমাজের বৃহৎ একটা অংশকে পেছনে ফেলে গোটা দেশটা এগিয়ে যেতে পারে না। সে কথাটাই তিনি দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

"যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে নিচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

তিনি বিশ্বাস করতেন যে এই সব বঞ্চিত মানুষের মুক্তির মাধ্যমেই সাধিত হবে দেশের সত্যিকারের উন্নতি তাই তিনি বলেছেন—

এই সব মূঢ়, মূক মুখে দিতে হবে ভাষা
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

এইসব বঞ্চিত ও সর্বহারা মানুষ কোন বিশেষ ধর্ম, সম্প্রদায় বা জাতের নয়। মানুষ হিসেবেই তিনি তাদের দেখেছেন। তাই উদাত্ত কণ্ঠে সবাইকে আহবান জানিয়েছেন—

এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য, হিন্দু-মুসলমান
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান।

এই সব লাঞ্ছিত মানুষ কোন দেশেরও নয়। হতেও পারে না। কারণ তিনি বিশ্ব কবি। তাই দেখি তার দরদী মন ছুটে গেছে সুদূর আফ্রিকার অরণ্যে চির নিপীড়িতা মানবীর কাছে। তাঁর 'আফ্রিকা' নামক কবিতায় পাই তারই সন্ধান, শুনি তার আহবান—

এসো তুমি যুগান্তের কবি,
আত্ম অবমাননার আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে
ওই অবমানিতার দ্বারে
ক্ষমা ভিক্ষা করো।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা লোকোত্তর। দেশ এবং কালজয়ী। বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির এক অমূল্য সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিশাল, বিপুল, বিভিন্নমুখী ও বৈচিত্রপূর্ণ। তাঁর কাব্যের একটি দিক নিয়েও আলোচনা করা এই স্বল্প-পরিসরে সম্ভব নয়। তাই আমার এই আলোচনা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ ছিলেন মানুষের কবি। মানুষের প্রতি মমত্ববোধই তাঁর কাব্যের প্রধান উপাদান। মানুষের ছোট-খাট সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, প্রেম-প্রীতি, অনুরাগ-বিরাগ, শিল্পসুলভ চাতুর্য্যের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন তিনি তাঁর কাব্যে। তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে মনে হবে যেন পাঠকের মনের কথা অলক্ষ্যে জানতে পেরে কবি সুনিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন প্রতিটি মানুষের অন্তরের অকথিত বাণী, ধরা পড়েছে কবিতায় লেখনীতে কথায় ও ছন্দে। আর সেই জন্য তার কবিতা পাঠকদের হৃদয় জয় করতে পেরেছে।

রবীন্দ্রনাথ একদিন যেমন পল্লী সংস্কারে উদ্যোগী হয়ে ছিলেন। অন্যদিকে তিনি বিশ্ব-ভারতী ও শ্রীনিকেতনের মতো মহান প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তাঁর সৃজনশীল ক্ষমতার এক জ্বলন্ত স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এতগুলো গুণের সমন্বয় পৃথিবীর অন্য কোন মহাপুরুষের মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি কবি— বিশ্ব কবি। তাঁর জন্যই বাংলা ভাষা আজ বিশ্বের দরবারে স্থায়ী সম্মানের আসন লাভ করেছে।

২

রবীন্দ্রনাথের মতো সর্বতোমুখী প্রতিভা না হলেও নজরুল একাধিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সঙ্গীত স্রষ্টা, সাংবাদিক, সৈনিক ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি গাইতে পারতেন এবং অভিনয়ও করতেন।

তাঁর উপন্যাস ও নাটকের সংখ্যা খুবই কম। তবে তিনি অজস্র গান লিখেছেন। অনেকের মতে নজরুল সঙ্গীতের সংখ্যা নাকি সর্বাধিক। এই সব সঙ্গীত বিভিন্ন ধরনের সুর এবং ভাবের দিক দিয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ। তিনি নিজে ছিলেন একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাংবাদিক এবং সাফল্যের সঙ্গে দৈনিক নবযুগ সহ বিভিন্ন সংবাদ-পত্র ও সাময়িকী সম্পাদনা করেন। রাজনীতির সঙ্গে তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার ফলে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। গরীবের ঘরে জন্ম নজরুলের। জীবিকা অর্জনের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন তিনি। এই সংগ্রামে বার বার ব্যহত হয়েছে তাঁর শিল্প সাধনা। একনিষ্ঠ সাধনার ফল তাঁর সঙ্গীত ও কাব্য নাম মাত্র মূল্যে বিক্রি করে মেটাতে হয়েছে জঠরের জ্বালা। দারিদ্র্যের কষাঘাত তাঁকে সাম্যবাদী আদর্শে করেছে উদ্বুদ্ধ, দিয়েছে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা। অভাবের তাড়নায় তাকে যেতে হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে। কবিকে হতে হয়েছে সৈনিক— বীণা ছেড়ে তিনি ধরলেন তলোয়ার। সৈনিক জীবনও তাঁকে দিয়েছিল সংগ্রামী চেতনা আর সেই চেতনার বিকাশ আমরা দেখতে পাই তাঁর কবিতার প্রতি ছত্রে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার দীপ্তি যখন বাংলার আকাশ-বাতাস ব্যাপ্ত করে রেখেছে তখন নজরুলের আবির্ভাব প্রচন্ড গতিশীল উল্কার মতো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বক্রীয়তায়

ভাস্কর। বাংলা সাহিত্যে তিনি আমদানী করলেন এক নতুন সুর—বিদ্রোহের সুর। আনলেন প্লাবন আনলেন প্রাণপ্রবাহ।

কিন্তু কার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ। রাজবন্দীর জবানবন্দী থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। কবির নিজের ভাষায় শুনুন ঃ

"আমি শুধু রাজার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই—সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার তরবারীর আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে......উৎপীড়িত আর্ত বিশ্ববাসীর পক্ষে আমি সত্যবারি। ভগবানের আঁখি জল।"

সমাজের সব অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে গোঁড়ামি ও কুসংস্কার, শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন কবি। বিদ্রোহ করেছিলেন মানুষের মঙ্গল, কল্যাণ ও উন্নতির জন্য। মানুষের জন্য এই দরদ তাঁর কাব্যকে করেছে মহিমান্বিত।

নজরুল ছিলেন মানবতাবাদী। গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস বলেছেন—Man is the measure of evrey thing. চণ্ডীদাসের কাব্যে তারই প্রতিধ্বনি শুনি—"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"

রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও এই মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে নজরুল ইসলাম গেয়ে উঠেছেন—

গাহি সাম্যের গান-
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।

তিনি শুধু ধর্ম, দরিদ্রের মধ্যে সাম্য নয়, জাতিতে-জাতিতে, ধর্মে-ধর্মে, নারী-পুরুষের মধ্যে তিনি সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু কিভাবে আসবে সেই সাম্য। বিপ্লবী কবি এর জবাবও দিয়েছেন। অসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য যারা দায়ী তাদের উৎখাতের মধ্যে দিয়েই আসবে পৃথিবীতে স্থায়ী সাম্য—

লোভী রাক্ষস ভোগীদের সংহার করি পৃথিবীতে
পূর্ণ সাম্য আনিব, দানিব অমৃত বঞ্চিতে।

তিনি জানতেন সকল সামাজিক অসাম্যের জন্য দায়ী আমাদের পুরাতন ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থা। তাই তিনি একে ভেঙ্গে গড়তে চেয়েছেন এমন সমাজ যেখানে—

ধরার সকল মানুষ দু'বেলা অন্ন পাইবে পাতে
নগ্ন শরীরে বস্ত্র পাইবে, অস্ত্র পাইবে হাতে।
বিনা ঔষধে পথ্য না পেয়ে ছেলে মেয়ে মরিবে না
শিক্ষা পাইবে, দীক্ষা পাইবে, দাসত্ব করিবে না।

কবির মতে এটা তখনই সম্ভব যখন দেশে শ্রেণীহীন শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। শ্রমজীবীরা যখন হবে সমাজ ব্যবস্থার নিয়ন্তা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী। আশাবাদী কবি তাই বলেছেন—

সিক্ত যাহাদের সারা দেহ মন
মাটির মমতা বসে
এই ধরনীর হাল রবে
তাহাদেরি বশে

সেদিন বঞ্চিতরা অংশীদার হবে পৃথিবীর সব ধন-সম্পদ ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের। সর্বহারারা হবে সেদিন সর্বজয়ী।

কিন্তু সংগ্রাম ছাড়া কখনও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই বিঘ্নসঙ্কুল সংগ্রাম মুখর সেই পথেই আহবান জানিয়েছেন—

ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম মাঝ
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাড়া সবে আজ।

সেই সঙ্গে তিনি সবাইকে সাবধান করে দিয়েছেন এ যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে–

"এ তুফান ভারী দিতে হবে পাড়ি"

এই সংগ্রামে আত্ম-ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। এর জন্য চাই অফুরন্ত সাহস। ক'জন পারে তা? কবির প্রগাঢ় আস্থা ছিল দেশের যুব শক্তির উপর তাই তাদেরই উদ্দেশ্যে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন—

কে আছ জোয়ান
হও আগুয়ান
আছে কার হিম্মত?

সৈনিক নজরুলের চেয়ে বেশি সাহস কার আছে? তাই তিনি শুধু অন্যদের আহ্বান জানাননি। সর্বাগ্রে নিজেকে সেই যুদ্ধের পুরোভাগে স্থাপন করে। এখানে কবির মূল্যবোধের অনন্য পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি উচ্চারণ করেছেন–

মহা বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

এর আগে আর কোন কবি এমন ভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারেন নি। এই বিদ্রোহের সুরটা নজরুলের একান্তই নিজস্ব এবং এখানেই তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য।

মীর্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতালের '১৯৬৫-এর এক অনুষ্ঠানে পঠিত।

সভ্যতার সংকট
ডাঃ আলীম চৌধুরী

গোড়াতেই বলে রাখছি, আমি কবি নই। নিছক আনন্দ দানের জন্য লেখা হয় নি আমার এ কবিতা। পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটাকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি কবিতার মারফত। কারণ কবিতা হলো এমন একটা মাধ্যম যার আবেদন সার্বজনীন। রীতি বিরুদ্ধ হলেও এবং আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটার সম্ভাবনা থাকা সত্তেও সমস্যার গুরত্ব বিবেচনা করে এই উপলক্ষে আমি ভূমিকা স্বরূপ দু'চারটা কথা বলবো। আণবিক অস্ত্রের উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার ফলে পৃথিবী আজ ধ্বংসের মুখোমুখী। যে কোন উত্তেজনাকর পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে একবার আণবিক যুদ্ধ বাধলে মানব সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সেটা হলো এক দিক। অন্য দিকে আণবিক বিস্ফোরণের ফলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর সর্বত্র। খাদ্য ও আবহাওয়া বিষাক্ত করে বিপদাপন্ন করছে মানুষের জীবন। আমি, আপনি কেউ রেহাই পাচ্ছি না। কিছুদিন আগে পাকিস্তানের এক অন্যতম সুসন্তান বিচারপতি কায়ানী লিউকিমিয়া রোগে' প্রাণ হারালেন। খবরটা পড়তে পড়তে আমি ভাবছিলাম–তার মৃত্যুর জন্য দায়ী কারা? সেটা নির্ধারণ করার সময় হয়তো এখানো আসেনি। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফলে একথা আজ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে আণবিক রশ্মি ক্যান্সার, লিউকিমিয়া, রক্তাল্পতা, বন্ধ্যাত্ব, গর্ভপাত ইত্যাদি রোগের জন্য বহুলাংশে দায়ী এবং আণবিক বিস্ফোরণ শুরু হবার পর থেকে এই সমস্ত দূরারোগ্য ব্যাধি ক্রমেই অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে চলেছে।

আণবিক অস্ত্র ও বিস্ফোরণের ধ্বংসকারী ক্ষমতা আপনাদের সবারই জানা। যা আপনারা অনেকে হয়তো জানেন না সেটা হলো বিস্ফোরণের দীর্ঘ মেয়াদী ফলাফল। সেটা আরও ভয়াবহ। ক্রমাগত বিস্ফোরণের ফলে এমন একটা সময় আসবে যখন মানব জাতির আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বদলে যাবে। অর্থাৎ মানুষ একেবারে না মরে, তিলে তিলে মরবে, বৈজ্ঞানিকদের ভাষায় একে বলা হয় "mutation of Genes" কথাটার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। মানবদেহ কতগুলো কোষ বা cell-এর সমষ্টি। কোষের মধ্যে থাকে

Gene । এই Gene-ই হচ্ছে আমাদের আকৃতি ও প্রকৃতির জন্য দায়ী। আণবিক রশ্মির প্রভাবে কোষগুলোতে এমন একটা রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া হয় যার ফলে Gene পরিবর্তিত হয়ে যায়।

তার জন্য অবশ্য প্রচুর Does বা মাত্রার প্রয়োজন কিন্তু যেভাবে ক্রমাগত বিস্ফোরণ ঘটছে তাতে সেই মাত্রায় পৌছুতে বেশি দেরী হবে বলে মনে হয় না।

যদি অবিলম্বে বিস্ফোরণ বন্ধ না করা হয় তবে আকৃতি বদলে ভবিষ্যতের মানুষ এমন একটা জীবে পরিণত হবে যাকে আর যাই বলা যাক মানুষ বলা যাবেনা। ইতিমধ্যেই বিকলাঙ্গ ও দানব শিশুর (Deformed and monster babies) জন্মের হার বেড়ে চলেছে।

প্রকৃতি বদলে যাবার ফলে যে সমস্ত গুণের জন্য মানুষ পৃথিবীকে জয় করতে পেরেছে, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা সে সব হারাবে। মানুষের সৃষ্টিধর্মী ক্ষমতা চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাবে। ডাক্তার হিসেবে আণবিক অস্ত্রের ধ্বংসকারী ক্ষমতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে বলেই এই ব্যাপারে আমার অনুভূতি অত্যন্ত প্রবল। আরও অনেকের মতো আমি বিশ্বাস করি—মানব সভ্যতাকে এই বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হলো-পৃথিবীর দেশে দেশে আণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে শক্তিশালী জনমত গড়ে তোলা। আর সেই উদ্দেশ্যেই লেখা এই কবিতাটি। কবিতাটির নাম-'সভ্যতার সংকট'।

জীবনের কল্যাণের তরে স্রষ্ট জ্ঞান বিজ্ঞানের
রকেট মিসাইল বানাইয়া আজ মানুষে মানুষ হানে।
নীতি-জ্ঞান করি বিসর্জন ক্ষমতার লোভ পৃথিবীকে
অবহেলে ঠেলে দেয় তারা নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে
পারমাণবিক ভষ্মে বিষাইছে পৃথিবীর আলো-বাতাস
মানব নিধন যজ্ঞে দানবেরা করিছে উল্লাস
সেই বিষ ছড়াইছে অহরহ জড়া-মৃত্যু ব্যাধি
নিষ্পাপ নির্দোষ মানুষের হতেছে জীবন্ত সমাধি
কত অসংখ্য বিকলাঙ্গ শিশু জন্মিছে প্রতিদিন
জন্ম নেবার আগেই কত প্রাণ হতেছে বিলীন
দেখিতে কি পাও পূর্বাভাষ। মানব আজিকে দানবের দাস
শত সহস্র বৎসরের গড়া সভ্যতার হইবে কি সর্বনাশ?
ওই শোন বাজে অনুখণ আণবিক যুদ্ধের দামামা
সৃষ্টি নাশের উল্লাসে শয়তান বাধে আমামা
হাজার হাজার নর-নারী পৃথিবীর দেশে দেশে
অসহায়ভাবে দিন যাপিতেছে কি নিদারুণ ত্রাসে

পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ আজ চিনিয়া রাখো তাদের
স্বার্থের লোভে যারা সর্বনাশ করিতেছে তোমাদের
মানব নিধন যজ্ঞের যারা পুরোহিত
কাণ্ডজ্ঞানহীন তারা ভুলিয়াছে হিতাহিত
তাদের তরে সাবধান বাণী উচ্চারিত হোক ঘরে ঘরে
সৃষ্টি ভুলিয়া যারা ধ্বংসের আয়োজন করে
একথা ধ্বনিত হোক দেশে দেশে বারংবার
পৃথিবীকে ধ্বংস করিবার নাই কারো অধিকার
এক সুরে বলো সবে করি প্রানমন
সভ্যতার শত্রুরা থামাও মৃত্যুর আয়োজন
ঝঙ্কার তোলো—ধ্বংস নয় সৃষ্টি, যুদ্ধ নয় শান্তি
আর নয় উন্মাদনা, নয়
আর ভুল ভ্রান্তি
সুন্দর পৃথিবীতে মানুষের মতো বাঁচিবারে চাই
ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে চিরকাল বাঁধা রহিবো সবাই। বিশ্বের মানুষ আজ হও এক প্রাণ।
বজ্র কণ্ঠে ঘোষিত হোক জীবনের জয়গান।

আকাশচারীর উদ্দেশ্যে

ডাঃ আলীম চৌধুরী

মর্তকে ভুলি স্বর্গে যাবার
ব্যর্থ প্রয়াস থামাও এবার।
পূণ্য লোভী শূন্য হাতে
ঘুরছো সদা আঁধারেতে।
এক দন্ড দাঁড়াও দেখি
ভাবো তুমি করছো একি?
জীবন তোমার শেষ কি হবে
মৃত্যুর কথা ভেবে ভেবে?
আর কত কাল স্বপ্ন দেখে
দিন কাটাবে কল্প-লোকে?
আকাশচারী শুনতে কি পাও
ধরার ধুলি ডাকছে তোমায়?
সময় হলো ফিরে আসার
খবর আমার নতুন আশার।
আর কতকাল এমনি ভাবে
দিন কাটাবে স্বপ্ন দেখে।
মৃত্যু ভুলি এবার তুমি
জেগে ওঠো জীবন চুমি।
শান্তি আনো হিংসা নাশি
সবার মুখে ফুটাও হাসি।
জয় করি দুঃখ-জড়া
সৃষ্টিকর নতুন ধরা।
যেথা নেই লোভ দ্বেষ
শান্তি ভরা এমন দেশ।
যেথা নেই অত্যাচারের খড়্গ
সেইতো সত্য সেইতো স্বর্গ।
আজ তাই আহ্বান জানাই
এসো ভাই মর্তকে স্বর্গ বানাই।

একটি অপ্রকাশিত কবিতা

রাষ্ট্রায়ত্ব স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

ডাঃ আলীম চৌধুরী

পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে থাকা মানুষের জন্মগত অধিকার। প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিটি নাগরিককে সমান চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ১৯৪৬ সালে বৃটেনের পার্লামেন্টে গৃহীত জাতীয় স্বাস্থ্য আইনে এই মূল নীতিটি সর্বপ্রথম স্বীকৃতি লাভ করে। এই আইনের বলে ১৯৪৮ সালে এদেশের সমগ্র স্বাস্থ্য ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ব করা হয়। এর ফলে রোগ-প্রতিরোধ, রোগ-নির্ণয় ও রোগ-নিরাময়ের পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগ ও সকল চিকিৎসক সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে। সুচারুরূপে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য স্বাস্থ্য সচিব দায়ী। কেউ যদি চিকিৎসা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় তার জন্য স্বাস্থ্য সচিবকে পার্লামেন্টের নিকট কৈফিয়ত দিতে হয়।

বৃটেনের জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং সুখী সমাজ গঠনের পথে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এর কল্যাণে অর্থাভাবে চিকিৎসা লাভের অসুবিধা দূরীভূত হয়েছে। আজ ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে এদেশের প্রতিটি মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন।

সাংগঠনিক দিক থেকে জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—

১. পারিবারিক চিকিৎসক বা সাধারণ ডাক্তার ইংরেজিতে যাকে বলা হয় General Practitioner বা Family Physitian)

২. হাসপাতাল ও বিশেষজ্ঞ

৩. জনস্বাস্থ্য বিভাগ

পারিবারিক চিকিৎসকই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মেরুদণ্ড। প্রতিটি মানুষ কোন না কোন পারিবারিক চিকিৎসকের তালিকার অন্তর্ভুক্ত। অসুখ হলে এই সব চিকিৎসকরাই চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে সমস্ত দেশকে কতগুলো অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি অঞ্চলে এক বা একাধিক ডাক্তার প্র্যাকটিস করেন। গড়ে প্রায় আড়াই হাজার রুগী প্রত্যেক ডাক্তারের তালিকায় থাকেন। বলা বাহুল্য এদের সবার

এক সঙ্গে চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। ডাক্তার বাছাইয়ের ব্যাপারে কোন বাধ্য বাধকতা নেই। রুগীরা ইচ্ছে মতো যে কোন ডাক্তারের তালিকাভুক্ত হতে পারেন। প্রয়োজন মতো অনায়াসে ডাক্তার বদলানোও সম্ভব পর।

সাধারণ ডাক্তাররা যখন কোন জটিল রোগের সম্মুখীন হন বা যখন তারা মনে করেন যে রুগীর বাড়িতে চিকিৎসা করা সম্ভব নয় তখন তারা সে সব রুগীদের হাসপাতালে ভর্তি করে দেন এবং সেখানে বিশেষজ্ঞরা তাদের চিকিৎসার ভার নেন। যে কোন রুগীর চিকিৎসার ব্যাপারে পারিবারিক চিকিৎসক বিশেষজ্ঞের মতামত চাইতে পারেন। প্রয়োজন হলে বিশেষজ্ঞ রুগীদের বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসার বিষয়ে ডাক্তারের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

জন-স্বাস্থ্য বিভাগ রোগ প্রতিষোধক ব্যবস্থা যেমন সংক্রামক ব্যাধির জন্য টীকা, বিশুদ্ধ খাদ্য-দ্রব্য ও পানীয় সরবরাহ ইত্যাদির ব্যবস্থা করে। এছাড়া প্রসূতি, শিশু ও ছাত্রদের জন্য বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র আছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পরিচালনার ব্যাপারে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি ও আঞ্চলিক পরিষদ স্বাস্থ্য সচিবকে সাহায্য করেন। আঞ্চলিক পরিষদে সরকারী কর্মচারী, সমাজকর্মী, চিকিৎসক ও জনগণের প্রতিনিধিরা একযোগে কাজ করেন। কারিগরী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত ও সাংগঠনিক ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ডাক্তারের ফিস্, রক্ত-মল-মূত্র, এক্সরে ও অন্যান্য যাবতীয় পরীক্ষার জন্য রুগীকে পয়সা দিতে হয় না। ওষুধের জন্য নামমাত্র দাম দিতে হয়। যাদের আর্থিক সঙ্গতি নেই তাদের ওষুধও বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। সব চেয়ে বড় কথা এসব কল্যাণকর ব্যবস্থা দেশের প্রতিটি অংশে ছড়িয়ে আছে। এবং প্রত্যেকটি মানুষ সমানভাবে উপকৃত হচ্ছে।

যেসব দেশে রাষ্ট্রায়ত্ব স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নেই অর্থাৎ— যেখানে স্বাস্থ্য ব্যক্তিগত দায়িত্ব সেখানে চিকিৎসা একটা পণ্যমাত্র। পয়সা থাকলে কেনা যায়। যার যতো বেশি পয়সা আছে সে তত ভালো চিকিৎসা পেয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে ধনীর সর্দি-কাশি হলেও বিশেষজ্ঞ ডাকা হয়। মারাত্মক রোগ হলেও মধ্যবিত্তরা উপার্জন-ক্ষমতা অনুযায়ী কেউ বা ডাকে এম. বি. কেউ বা এল. এম. এফ. আর কেউ কেউ শরণাপন্ন হয় হাতুরে ডাক্তারের। গরীবদের সে সৌভাগ্যও হয় না। এসব হতভাগ্যদের অনেকে বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারায়। এটা অন্যায় এবং নীতি বিরুদ্ধ কারণ কোন রোগ ধনীরই হোক আর গরীবেরই হোক সেটা সাড়াতে সমান জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রায়ত্ব স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তারই নিশ্চয়তা এনে দিয়েছে।

এবারে আসা যাক পাকিস্তানের কথায়। আমাদের দেশে প্রয়োজনের তুলনায় হাসপাতালের সংখ্যা অত্যন্ত কম। রুগীদের অধিকাংশই বাইরে চিকিৎসা লাভ করেন। মুখে যদিও বলা হয় চিকিৎসা মহত্তম পেশা, কার্যক্ষেত্রে ডাক্তারী একটা ব্যবসা মাত্র। কাজেই যে যত পয়সা খরচ করতে পারে সেই তত ভাল চিকিৎসা পেয়ে থাকে। যারা দরিদ্র তারা সামান্যতম চিকিৎসার ও সুযোগ পান না। অর্থাভাব রুগী ও ডাক্তারের মধ্যে এক বিরাট বাধার প্রাচীর সৃষ্টি করেছে।

সেজন্য সমাজ ব্যবস্থাই দায়ী। ডাক্তারের দোষ দেওয়া যায় না। আর পাঁচজনের মতো এরাও কাজের বিনিময়ে উপার্জন করেন। নিজের পরিবারের লোকজনদের ভরণ-পোষণ করতে হলে টাকার প্রয়োজন। টাকা দিতে পারেন তারাই যারা টাকা ওয়ালা। সুতরাং নিতান্ত আর্থিক প্রয়োজনের তাগিদেই আজ পাকিস্তানের অধিকাংশ চিকিৎসক মানবতার সেবা ছেড়ে বিত্তশালীদের সেবা করে বিত্তবান হবার চেষ্টা করছেন। রুগী ও ডাক্তারদের সম্পর্কটা অনেকটা লেন-দেনের। এর ফলে ডাক্তারেরা রুগীদের পুরোপুরি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন করতে পারছেন না অথচ সাফল্যজনক চিকিৎসার জন্য এগুলো অপরিহার্য।

ইংল্যাণ্ডের ডাক্তাররা নিজেদের ও পরিবারের লোকদের ভরণ-পোষণ ও স্বচ্ছন্দ জীবন যাত্রার পক্ষে পর্যাপ্ত মাইনে সরকারের কাছ থেকে নিয়মিত পাচ্ছেন। তাই টাকার জন্য আর তাদের ভাবতে হয় না। ডাক্তাররা এখন শুধু রোগের কথাই ভাবেন—ধনীর রোগ, গরীবের রোগ সমানভাবে। চিকিৎসা হয় রোগের গুরুত্ব অনুযায়ী। সামান্য রোগ হলে দেখেন সাধারণ ডাক্তার, মারাত্মক রোগ হলে বিশেষজ্ঞ। উভয়ক্ষেত্রেই বিনা মূল্যে। অর্থের লোভ বিবেককে আর আচ্ছন্ন করে না । এর ফলে চিকিৎসক ও রুগীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ব স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মানবতার সেবা ও রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মহান আদর্শকে কার্যে পরিণত করার পথ সুগম করে দিয়েছে।

নিবন্ধটি অপ্রকাশিত। বর্তমান গ্রন্থে প্রথম প্রকাশ হলো। রচনাকাল ১৯৬৪।

জীবনপঞ্জি

নাম	এ. এফ. এম. আবদুল আলীম চৌধুরী।
জন্ম তারিখ/ সময়	৩ বৈশাখ, সোমবার, ১৩৩৫। সকাল ১১টা।
জন্মস্থান ও পৈতৃক নিবাস	গ্রাম: খয়েরপুর, থানা: অষ্টগ্রাম, জেলা: কিশোরগঞ্জ, বাংলাদেশ।
পিতৃ নাম ও পেশা	মরহুম আবদুল হেকিম চৌধুরী, জেলা স্কুল পরিদর্শক।
মা	সৈয়দা ইয়াকুতুন্নেছা।
পরিবারের সদস্য	স্ত্রী শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী, প্রধান শিক্ষিকা, উদয়ন বিদ্যালয়। জ্যেষ্ঠ কন্যা ফারজানা চৌধুরী নীপা, তৃতীয় বর্ষ,এম.বি. বি.এস, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা। কনিষ্ঠ কন্যা নুজহাত চৌধুরী শম্পা, প্রথম বর্ষ, এম. বি. বি. এস, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ।
বড় ভাই	আবদুল করিম চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত এডিশনাল আই. জি. আর।
ছোট ভাই	আবদুল হাফিজ চৌধুরী, প্রকৌশলী।
বড় বোন	মিসেস রোকেয়া জামান।
শিক্ষাগত যোগ্যতা	ক. ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯৪৫, কিশোরগঞ্জ হাই স্কুল, কিশোরগঞ্জ। খ. আই. এস. সি, ১৯৪৮, ইসলামিয়া কলেজ, কোলকাতা। গ. এম. বি. বি. এস, ১৯৫৫, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা। ঘ. ডি. ও, ১৯৬১, রয়্যাল কলেজ অফ ফিজিসিয়ানস অফ ইংল্যান্ড।
কর্ম-অভিজ্ঞতা	ক. হাউজ ফিজিসিয়ান, হাউজ সার্জন ও রিসার্চ এ্যাসিস্ট্যান্ট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা। খ. অনারারি ক্লিনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট, মুরফিল্ডস্ আই হসপিটাল, লন্ডন। গ. সিনিয়র হাউস অফিসার (চক্ষু), রয়্যাল আই এ্যান্ড ইয়ার হসপিটাল, ব্র্যাডফোর্ড।

ঘ. রেজিস্ট্রার (চক্ষু), হুইপস ক্রস হসপিটাল, লন্ডন এবং সেন্ট জেমস হসপিটাল, লন্ডন।

ঙ. কনসালটেন্ট অপথালমিক সার্জন, কুমুদিনী হাসপাতাল, মির্জাপুর।

চ. এসোসিয়েট প্রফেসরঃ

১. আই. পি. জি. এম. আর, ঢাকা।

২. ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

৩. রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

৪. স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা

ক. পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশন (বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন)।

খ. অপথালমোলোজিক্যাল সোসাইটি অফ পাকিস্তান (বাংলাদেশ চক্ষু চিকিৎসক সমিতি)।

গ. এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান (বাংলাদেশ)।

ঘ. বাংলা একাডেমি, লন্ডন।

ঙ. ন্যাশনাল মেডিকেল হাসপাতাল, ঢাকা।